নিয়ম যখন ভাঙে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী



নিয়ম যখন ভাঙে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
স্বত্বাধিকারী : সি. এম. ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.
কলকাতা ৭০০০১৩

NIYAM JAKHAN BHANGE

by
Abhigyan Roychowdhury

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
(স্বত্বাধিকারী : সি.এম. ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি.)
৯৩এ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : অর্ক পৈতণ্ডী

ISBN 978-81-88856-77-0

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৪

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

মুদ্রক
শ্রী রবি ঘোষ
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রা. লি.
৯৩এ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩

উ ৎ স র্গ

স্নেহের সমুদ্র বসুকে এমন একজন পাঠক যাকে আমি নিজের লেখার আয়না বলে মনে করি। আজও লিখে চলেছি এরকম কিছু পাঠকের জন্যই।

মু খ ব ন্ধ

এক পাঠকের চোখে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী। নামটা শুনলেই গর্বিত হতে হয় আজকের যুগের শিশু-কিশোর সাহিত্যের সব বয়সী পাঠকদের। আজ থেকে একশো বছরেরও অনেক আগে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়ের হাত ধরে যে শিশু-কিশোর বাংলা সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল তার ধারা ক্রমবর্ধমান হয়ে সত্যজিৎ ও তার পরবর্তী যুগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সময় এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। অথচ আজকের দিনে যদি নতুন যুগের নতুন লেখকদের লেখায় আমরা চোখ রাখি, তাহলে যে গুটি কয়েকজন লেখক এখনও কিশোর সাহিত্যের সেই উন্নত মান ধরে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী অন্যতম।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী নব্বইয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত অসামান্য কিশোর পাঠ্য লেখা লিখে চলেছেন সেগুলো একবার পড়লে আর ভোলা কঠিন। ওনার কলমের দুরন্ত টানে কখনো অসহায় পাঠককে পৌঁছে যেতে হয় এক মায়াজাল বিস্তৃত ভবিষ্যতের কল্পবিজ্ঞান জগতে বা কখনো হারিয়ে যেতে হয় কোনো এক ভূতুড়ে জগতের প্রায়ান্ধকারে। ওনার উপন্যাস বা ছোটগল্পের মূলত দুটি ধারা আছে। একটি ধারা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে পাঠককে পৌঁছে দিচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে। তার সাথে থাকছে রহস্য, ভয় ও অ্যাডভেঞ্চার। দ্বিতীয়

ধারাটি হল বিপরীত মেরুর অর্থাৎ ভূত। সেখানে ওনার ভূতুড়ে কাহিনীকে বুঝতে হলে পড়তে হয় গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত, কারণ উনি কখনোই কোনো গল্পে একটি নরকঙ্কাল বা নরমুণ্ড এনে কোনো অবাস্তবতার সৃষ্টি করেন না। কখনোই কোনো চেনা পথে হাঁটেন না। আর সর্বোপরি এটা বলা প্রয়োজন যে, ওনার এই দুই ধারার লেখাই মিলে গেছে মর্মস্পর্শী মানবিকতার মেলবন্ধনে। যার উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যায় না। 'আমরা নেই', 'নিয়ম যখন ভাঙে', 'চানক্য' বা 'পার্কের সেই লোকটা'—প্রত্যেকটা লেখা পড়েই সেই মানবিকতাকে স্পর্শ করা যায়।

ওনার এই গল্প সংকলনে আমার মতো এক সাধারণ পাঠককে ভূমিকা লিখতে দেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্লুত। ওনার সমস্ত ভক্ত পাঠকের পক্ষ থেকে আমি ওনার সবরকম সাফল্য কামনা করছি এবং অনুরোধ রাখছি যাতে উনি আরো অনেক বেশি করে আগামী দিনগুলিতে লিখে যান ও বাংলা কিশোর সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহযোগে শেষ করলাম।

সমুদ্র বসু

সূ চি প ত্র



চাণক্য

নিয়ম যখন ভাঙে

কুন্‌জনডিওর নামটা ভারি অদ্ভুত। আরও অদ্ভুত এখানকার আবহাওয়া। দুপুরের বাতাসে যেমন আগুনের হলকা, তেমনি সন্ধে হতে না হতে বাতাসে হিমেল ছোঁয়া। অনিমেষ ঘরের বাইরে চেয়ারে বসে এসবই ভাবছিল।

রাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়িতে খাটিয়ায় শিবকুমার শুয়ে আছে। কেমপ্লাস্ট বলে একটা কোম্পানির ড্রাইভার সে। খাটিয়ার পাশে চাতালে বসে তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে। চাঁদের আলোয় বসে সপরিবারে গল্প করছে। তারই পাশের বাড়িতে থাকে এম. এন. কৃষ্ণন। বাজির ব্যবসা। ভেতরের ঘরে মেয়েকে পড়াচ্ছে।

এখানকার অধিকাংশই এরকম। সন্ধেবেলায় সব কাজের পরে হালকা মেজাজে সবাই মিলে গল্পগুজব করে। অনিমেষের সে উপায় নেই। এখানে এক বহুজাতিক সংস্থার সফ্‌টওয়্যার কমিশনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ও কিছুদিন হল এসেছে।

সিস্কল-পুরো কথায়, সাদার্ন আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড। সিস্কলে নতুন যে ব্লাস্টফার্নেস চালু হতে চলেছে, তার পুরো সফ্‌টওয়্যারই অনিমেষের লেখা। তাই দিন নেই, রাত নেই কাজ করে চলেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ব্লাস্টফার্নেস চালু করতে হবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে ল্যাপটপে সফ্‌টওয়্যার দেখতে শুরু করে অনিমেষ। এখানে ওটাই ওর অবসর বিনোদন।

—কত'য় পেলে?

প্রশ্নটা আসে পাশ থেকে। প্রশ্নকর্তাকে দেখে চমকে ওঠে অনিমেষ। এখানকার সবার ধারণা অনিমেষের পাশের বাড়ির এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সম্পূর্ণ পাগল। তার ওপরে এরকম জায়গা, যেখানে তামিল ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শোনার কথা ভাবাই যায় না—সেখানে একেবারে বাংলা।

ধাক্কাটা সামলানোর আগেই ফের প্রশ্ন,—ল্যাপটপটা কত'য় কিনলে?

—এটা আমাদের কোম্পানির, ঠিক জানি না। তবে খুব সম্ভবত পঁচাত্তর হাজারের কাছেপিঠে। তা আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ।— বলেই তড়বড়িয়ে উনি অনিমেষের বাড়ির গেট খুলে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

অদ্ভুত লোক তো! এখানে এরকম প্রত্যন্ত জায়গায় আরেকজন বাঙালির দেখা পাওয়াটা রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ উনি আলাপ-পরিচয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না।

এখানে প্রায় দু'মাস হতে চলল অনিমেষের। কিন্তু পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা এই প্রথম। অনিমেষ লক্ষ্য করেছে রোজ গভীর রাত অবধি পাশের বাড়িতে আলো জ্বলে। খুটখাট শব্দ হয়।

পাশের বাড়িতে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে থাকে একজন কাজের লোক। তারও হাবভাব বাবুরই মতো।

নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে বাড়ির কাজের তামিল মেয়েটিকে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে সে মাথার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মুচকি হেসে জানিয়েছে— 'পাইত্তয়াম।' অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাগল। ওই একই উত্তর আরো কয়েকজনের কাছে পেয়েছে। তাই পাশের বাড়ির থেকে দূরে থাকাই ঠিক করেছিল অনিমেষ। কিন্তু আজকের ঘটনায় ফের আলাপ করতে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পরের দিন অনিমেষের কাজ থেকে ফিরতে ফিরতে রাত আটটা হয়ে গেল। খানিক আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাইরে চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে অনিমেষের চোখ পড়ল পাশের বাড়ির দিকে। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথার পিছনে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। আলাপ করার এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

ভালো একটা জামা গায়ে গলিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকতে যায় অনিমেষ। গেট ঠেলে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ প্রশ্ন,

—কাকে চাই?

উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল—কৃষ্ণ, বাবুকে আসতে দে। আরে, এসো এসো।

ভদ্রলোক চোখ বুঁজেই বলে ওঠেন।

কৃষ্ণ ঘর থেকে আরেকটা চেয়ার বার করে দেয় অনিমেষকে।

—বসো। তুমি বলছি বলে কিছু মনে করো না। তুমি আমার নাতির বয়সী।

—তা আপনি একাই থাকেন?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী পনেরো বছর সাতমাস একুশদিন হল মারা গেছেন। —চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—ছেলে পিলে নেই। ওই আমি আর কৃষ্ণ। এমনিই আমার চাহিদা খুব কম, তাই এ জায়গায় চলে যায় আর কি! তা তুমি এখানে ক'দিন আছ?

—প্রায় মাস দুয়েক হতে চলল। আর দিন দশ-পনেরো। মনে হয় তার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

—তুমি কোন কোম্পানিতে কাজ কর?

—সিমেন্স। আমি সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এখানকার ব্লাস্টফার্নেসের প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলারের সফ্‌টওয়্যার আমারই লেখা। তা, আপনি এখানে ক'দিন আছেন?

—বিশ বছর তিনমাস দু'দিন হল আজ নিয়ে। তার আগে মাদ্রাজ আই.আই.টি.-তে কম্প্যুটারর-সায়েন্সের প্রফেসার ছিলাম।

—তাই নাকি! তা এখানে এলেন কেন? -অনিমেষের গলায় সম্ভ্রমের সুর।

—কারণ আমি তোমাকে পরে বলব। আজ রাত এগারোটা নাগাদ এসো। একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব তোমাকে।

রাত এগারোটায় একজন আধপাগলা লোকের সঙ্গে দেখা করতে আসাটা ঠিক হবে কি না, সেই চিন্তায় অনিমেষ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। প্রফেসার রীতিমতো প্রশ্নের সুরে বলে উঠলেন, —আচ্ছা বল তো বৃষ্টির জন্যে এই যে মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাচ্ছ, এর কারণ কী?

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে মাটির গন্ধ থেকে পাগলামির গন্ধই বেশি পায় অনিমেষ। কয়েক সেকেন্ড পর বলে ওঠে,—ঠিক জানি না।

—জানা উচিত ছিল। এসব সাধারণ জিনিস না জানতে পারলে পড়াশুনো করে কি লাভ। .....মাটিতে স্ট্রেপটোমাইসেটিস বলে একধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। বৃষ্টির জলে ভিজে গেলে এরা জিওস্‌মিন ও মিথাইল আইসোবোর্‌নিওল নামে দুটো যৌগ দেহ থেকে ছাড়ে। এই যৌগের জন্যই মাটি থেকে ওই সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়,—বুঝলে!

হতবাক হয়ে অনিমেষ মাথা নাড়ে। উঠতে যাবে, কিন্তু ইতিমধ্যে

মুড়ি আর বাদাম এসে পড়ায় বাধ্য হয়ে বসতে হয়। দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠেন, —কাল শ্রীহরিকোটা থেকে জিওসিন্‌ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল ছাড়বে। তাই খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। পুরোপুরি ভারতে তৈরি। কত গর্বের কথা তাই না!

ভদ্রলোকের আনন্দে চক্‌চক্ করে ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানায় অনিমেষ। ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করেন, কয়েক বছর আগে রাশিয়ার কাছে হাত পাতছিল। পরে রাশিয়া দিতে রাজি না হওয়ায় পুরোপুরি নিজের প্রযুক্তিতেই তৈরি করেছে। কালকে ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে আমরা নিজেরাও পারি।

—কিন্তু কাল পারবে তো? বেশির ভাগ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেলই তো ঠিকমতো কাজ করে না।

সামনের টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে অনিমেষের চায়ের কাপ উল্টে ভদ্রলোক বলে ওঠেন, —আমাদের এটাই দোষ। আমরা নিজেদের ওপর ভরসা রাখতে পারি না। আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যাপারেই দেখ না। তুমি জানো আলট্রোসোনোগ্রাফি কিভাবে কাজ করে?

সামান্য মুড়ি খেতে গিয়ে এতটা বিপদে পড়তে হবে ভাবতে পারেনি অনিমেষ। কোনরকমে মান রক্ষা করতে বলে ওঠে,—খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের সাহায্যে দেহের ভেতরের ছবি তোলা হয়।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ শরীরের কোনো অংশের উপর ফেলা হয়। কোনো জায়গায় পেশীর ঘনত্বের সামান্য পরিবর্তন হলেই সেখানে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনির সাহায্যে হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি এসবেরও ছবি পাওয়া গেলেও ছোট রক্তকোষের ছবি তোলা যায় না। আজ থেকে পঁচিশ বছর

আগে মাদ্রাজ আই.আই.টি.-র একজন প্রফেসর বলেছিলেন ডপ্‌লার এফেক্‌টের সাহায্যে তাও সম্ভব। —ডপ্‌লার এফেক্‌ট কী জানো তো?

—হ্যাঁ, শ্রোতা আর শব্দের উৎসের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে শব্দের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। যদি শ্রোতা উৎসের দিকে এগোয়, শব্দের কম্পাঙ্ক শ্রোতার কাছে বেড়ে যায়। উল্টোদিকে হলে কমে যায়।

বাহ্ বাহ্ —বলে চেয়ারটাকে আরো অনিমেষের দিকে টেনে এনে ভদ্রলোক বলে ওঠেন,— হ্যাঁ, ঠিক একইভাবে শব্দের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে রক্তপ্রবাহ বোঝা যায়। রক্তের দিকে একটা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্গের শব্দ পাঠালে রক্তের গতির ওপর নির্ভর করে কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়। তাই কালার প্রসেসারের মধ্যে দিয়ে এই সঙ্কেত পাঠালে কম্পাঙ্ক বাড়া বা কমার উপর নির্ভর করে লাল ও নীল রঙের শ্রেণী পাওয়া যায়। লাল রঙ দেখায় যে রক্ত শব্দের উৎসের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, নীল রঙ দেখায় রক্ত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক কিনা?

অনিমেষ প্রচন্ড জোরে মাথা নাড়ে। তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার আশায়।

—এই পদ্ধতিতে যাকে আজকাল আলট্রাডোপোগ্রাফি বলা হচ্ছে, নির্ভূলভাবে ব্রেনস্ক্যান করা সম্ভব হয়েছে। পঁচিশ বছর আগে একথা কে বলে গেছিল জান?

বলির পাঁঠার মতো মাথা নাড়ে অনিমেষ,—না।

—আমি-আমি। ইয়েস—এই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেদিন আমার কথায় কেউ এ গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। আর আজ তারই জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে আমেরিকা থেকে মেসিন কিনে বসাচ্ছে, ব্রেনস্ক্যানিং-এর জন্য। এর জন্য দায়ী কী জান? হীনমন্যতা। আমরা ভারতীয়রা নিজেদের ছোট ভাবি।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি এবার উঠি। —এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

—ঠিক আছে, আমারও একটু কাজ আছে। তুমি কিন্তু আজ রাতে আসছ।

—হ্যাঁ, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আসব।

বাড়িতে এসে টিভি খুলে বসল অনিমেষ। সান টিভিতে তামিল গান চলছে। এ ক'দিন এখানে আসার পর থেকে চারপাশের অর্ধশিক্ষিত লোকজন দেখে অনিমেষের নিজের ওপর বিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে নিজেকে অন্যরকম লাগছে। ভদ্রলোকের অগাধ পান্ডিত্য। রাতে কি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবেন বলেছেন। অত রাতে যাওয়া কি ঠিক হবে! সাতপাঁচ ভেবে অনিমেষ ঠিক করল, শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি যাবে। যা থাকে কপালে।

রাত দশটায় ওনার বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনিমেষ। গেট বন্ধ। কলিংবেল টিপতেই ভেতরের দরজা খুলে গেল। শ্যামাপ্রসাদবাবু বেরিয়ে এলেন। ঘরের ভেতর থেকে দেবব্রত বিশ্বাসের গান ভেসে এল—"আরো আরো প্রভু, আরো আরো"।

ঢুকতেই একটা ছোট প্যাসেজ। ডানদিকে ড্রয়িংরুম। সোফাসেট সাজানো। সামনের টেবিলে বইয়ের স্তূপ। উল্টোদিকের আলমারিতে অজস্র ক্যাসেট। বেশিরভাগই রবীন্দ্রসঙ্গীতের। ঘরের মাঝখানে একটা চওড়া কাঠের দোলনা আছে। এটা দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বাড়িতেই দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের বাড়িতে তো থাকবেই।

কৃষ্ণ এসে সরবত দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটা অনটনের ছাপ

পড়েছে। সামনের পালিশ-চটা টেবিলটা, ঝাড়লণ্ঠনের জ্বলতে থাকা একটা মাত্র আলো—তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আরো খানতিনেক বই টেবিলের অবশিষ্ট জায়গায় রেখে বললেন, —দেখ বইগুলো। খুবই সরলভাবে লেখা। ভীষণ ইন্টারেস্টিং। আমি একটু প্রস্তুত হয়ে আসছি। বলেই পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে ভেতরে কি করছেন কে জানে? অনিমেষ বই তিনটে এক এক করে নেড়েচেড়ে দেখল। তিনটেই দুর্বোধ্য রোবটিক্স-এর ওপর। তার থেকে গান শোনাই ভাল।

মিনিট দশেক পরে শ্যামাপ্রসাদবাবু পাশের ঘর থেকে ডাক দেন, —ভেতরে এস। অনিমেষ, ভেতরে এস। ঘরে ঢুকতেই শ্যামাপ্রসাদবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষ।

ঘরে একটা সবুজ আলো এবার ছড়িয়ে পড়ল। একটা রঙচটা হাতলওয়ালা চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু বলে ওঠেন,—বসো। আগে তোমাকে রোবটিক্স সম্বন্ধে কিছু বেসিক কথা বলে নিই। একটা আধুনিক রোবট তৈরী হয় লোহা, স্টিল আর প্লাসটিক দিয়ে। এর তৈরির সময় মূলত দুটো জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়। রোবটের কোন কোন অংশ ঠিক কিভাবে চালনা করা দরকার। যেমন ধরা যাক হাত, ঘাড়, কব্জি—একেকটার একেকরকম মুভমেন্ট। সেই অনুযায়ী মেকানিকাল ডিজাইন করা দরকার। আর রয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। রোবট টিভিক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদির সাহায্যে চারপাশে লক্ষ্য রাখে। ওই সমস্ততে তোলা ছবি আলোকসংবেদী কোষের মাধ্যমে

তড়িৎসঙ্কেতে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন সেন্সরে যায়। আর সেইসব সেন্সর থেকে তড়িৎসঙ্কেত যায় কম্পিউটারে। এই কম্পিউটারই হল রোবটের ব্রেন। এই কম্পিউটারে যেরকম প্রোগ্রাম থাকে সেই অনুযায়ী রোবট কাজ করে।

অনিমেষ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, —কিন্তু আপনি কী দেখাবেন বলেছিলেন?

—জানি জানি—দেখাব। তার আগে কিছু কথা বলে নিই। আমি তখন মাদ্রাজ আই.আই.টি.তে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রোবটিক্স নিয়ে গবেষণায় মেতে আছি। হঠাৎ ডি. আর. ডি. ও অর্থাৎ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট্ পেলাম। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য গুপ্তচর রোবট তৈরি করতে হবে। এর চেহারা হাবভাব হবে হুবহু সাধারণ মানুষের মতো, যাতে বিপক্ষ দেশের সামরিক সংস্থায় ঢুকে খবর আদায় করতে পারে। রোবটের নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকবে, যাতে ও ধরাবাঁধা কাজের বাইরে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারে। শুধু তাই নয়, রোবটের হিপ্নোটিজম-এর ক্ষমতা থাকাও বাঞ্ছনীয়, যাতে সহজেই ও অন্য কাউকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে পারে।

ব্যাপারটা শুনেই বুঝতে পারছ তো, যে-কোনো বিজ্ঞানীর কাছেই এটা একটা অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ। আমি আর প্রফেসার ওয়াই. এন. শর্মা ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাজটাতে। কিন্তু সাফল্য তো আর একদিনে আসে না। একবছর যেতে না যেতেই ওয়াই. এন শর্মা ধৈর্য হারালেন। ওই প্রজেক্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার দিনরাত জুড়ে রইল চাণক্য। ওই নামটাই

ঠিক করে রেখেছিলাম রোবটটার জন্য। একটা কৃত্রিমভাবে তৈরি চামড়া রোবটের গায়ে পরানো হল। চামড়ার নিচে রইল লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রনিক প্রিন্টেড বোর্ড, যারা অনুভব করতে পারে। এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সাফল্য পেলাম। গায়ে একটা ছুঁচ ফোটালে, ও সেই ছুঁচের ব্যাসার্ধ বলে দিতে পারে।

রোবটের ভেতরে পঞ্চান্নটা মাইক্রোফোন বসালাম— পঞ্চান্নটা-যারা চারপাশে শব্দতরঙ্গকে তড়িৎসঙ্কেতে পরিবর্তিত করে কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে ও বিভিন্ন লোকের কথা বুঝতে পারবে—একবার কথা বললেই চিনে রাখবে।

বছরখানেকের মধ্যেই সাফল্য পেলাম। চাণক্য একদম স্বাভাবিক মানুষের মতো আর পাঁচজনের সঙ্গে কথার আদান-প্রদান করতে শিখল। কম্পিউটারে সফ্টওয়্যার এমনভাবে লিখলাম, যাতে ও বিচার করে চটপট উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। লজিকাল রিজনিং, আর জাজমেন্ট— এসব কাজে খুব দরকার।

এভাবে গবেষণা যখন চলছে সাফল্য অসাফল্যের পথ ধরে, হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত, খবর পেলাম আমাদের প্রোজেক্ট বাতিল হয়ে গেছে। বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে ওই ধরনের রোবট কেনা হয়েছে। অবশ্য তার গুণমান আমার চাণক্যের থেকে অনেক খারাপ।

শুধু তাই নয়—আমার অসম্পূর্ণ চাণক্যকেও ফেরত দিতে হবে ডি.আর.ডি. ও—এর কাছে।

দুঃখে হতাশায় আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আমি দেব না— কিছুতেই দেব না। ঠিক করলাম চাণক্যকে চুরি করে অন্য কোথাও পালিয়ে

যাব। চলে এলাম কুন্‌জনডিওরে।

তখন এ জায়গাটা আরও ফাঁকা ছিল। চাকরি গেলেও আমার বেশ কিছু সঞ্চয় ছিল। তা দিয়েই বাকি কাজে লেগে পড়লাম।

এরপরে রোবটের মধ্যে এমন কিছু যন্ত্র জুড়ে দিলাম যাতে প্রচন্ড তেজস্ক্রিয় পরিবেশে এবং আগুনের মধ্যে ও কাজ করতে পারে। চাণক্যের হাত-পা নাড়ানাড়ির কাজে ইলেকট্রিক সার্ভোমোটর আছে। এত নিখুঁতভাবে তা চালনা করে, যে বোঝাই যায় না যে চাণক্য স্বাভাবিক মানুষ নয়।

এই রোবটকে কন্ট্রোলের জন্য ইনফ্রারেড-তরঙ্গ ব্যবহার করলাম, যাতে দূর থেকেও ওকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অবশ্য নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থাতেও রোবট কাজ করতে পারে নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধির সাহায্যে। আর এই জায়গাতেই বেশ মুশকিলে পড়লাম।

রোবটের আর যাই হোক সাধারণ বিচারবুদ্ধির ব্যাপারটা খুবই কম। চিন্তাশক্তি বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্ররচনাবলী কিনে দিলাম, কিন্তু ও দেখি তা ছেড়ে 'সান টিভি'র নাচগান দেখে। লোকের সঙ্গে কিরকম মিশতে শিখেছে পরীক্ষা করতে কৃষ্ণের সঙ্গে বাজারে পাঠালাম। তাতেও সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। পচা আলু দিয়েছে বলে দোকানীর কান মলে দিয়েছে। তারপর যা হয় আর কি! আমি কৃষ্ণকে রান্নায় তেল কম দিতে বলি-ও সেটা শুনেছে, লক্ষ্য করেছে। পরে একদিন শুনলাম সামনের বাড়ির এক বৌকে বেশি তেলে রান্না করতে দেখে, ও তাকে রীতিমতো ধমক ধামক দিয়ে এসেছে।

অবশ্য পরের দিকে ওর এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

তবে একটা জিনিস চাণক্যের ব্যাপারে বলতেই হবে। ওর দেশভক্তি।

জনগনমন শুনলেই দাঁড়িয়ে ওঠে। ক্ষুদিরামের গল্প শুনলে চোখ ছলছল করে। অবশ্য হবে নাই বা কেন, ওর মাইক্রোপ্রসেসারে স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর প্রায় দেড়হাজার বই-এর তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

চাণক্যের ওপর আমার গবেষণা যখন প্রায় শতকরা নব্বইভাগ সফল, তখন আমার গবেষণার সাফল্য জানিয়ে ভারতের নানান বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানে চিঠি লিখলাম। যদি কিছু অর্থসাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে গবেষণা আরো একটু এগোনো যায়। কারণ আমি তখন দেনার দায়ে ডুবে গেছি। গবেষণা আমার একার পক্ষে চালানো অসম্ভব। চাণক্যের মধ্যে হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা, অন্যের মনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তৈরির জন্য বেশ কিছু দুর্মূল্য যন্ত্র লাগবে। কিন্তু আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করল না, সাহায্য তো দূরের কথা!

অনিমেষ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে,—এখন চাণক্য কোথায়?

—ওই যে বড় বাক্সটা দেখছ ওর মধ্যে। ওঃ হো, এখন তো ওর ঘুমোবার সময়। আর তো ওকে ডাকতে পারব না। ঠিক আছে সব তো শুনে গেলে, পরে আর একদিন এসো দেখাব।

অনিমেষকে এরপরে বাড়ির গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু ফিরে গেলেন।

পরের দিন এ ব্যাপারে অনিমেষ কথা বলছিল সুন্দরেশনের সঙ্গে। কি অভাবনীয় আবিষ্কার! অনিমেষ শ্রদ্ধায় বিগলিত।

সুন্দরেশন খুব গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ শুনে জিজ্ঞেস করল,—তা, তুমি সে চাণক্যকে দেখেছ?

অনিমেষ মাথা নাড়ে। জানায় চাণক্য তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হাসিতে ফেটে পড়ে সুন্দরেশন,—তুমিই এরকম একমাত্র বোকা নও। তোমার

প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউই বাদ পড়েনি। কেউই চাণক্যকে দেখেনি। শ্যামাপ্রসাদবাবুর চাণক্য খালি ঘুমোয়। বাক্সের মধ্যে। হাঃ.... হাঃ....

অনিমেষ লজ্জায় হেসে ফেলে,—আসলে এমনভাবে বলছিলেন যে কথাটা মিথ্যা হতে পারে, ভাবতেই পারিনি।

সুন্দরেশন বলে ওঠেন,—হ্যাঁ, ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয়। খুবই প্রতিভাবান ডেডিকেটেড লোক। তবে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে তো সবসময় সবকিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বছরের পর বছর চেষ্টার পরেও যখন দেখেছেন যে ওনার গবেষণায় কোনো কাজ হচ্ছে না, তখন মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ক্রমাগত ব্যর্থতার চাপে উনি একদম ভেঙে পড়েছেন। এখন ওনাকে একধরনের পাগলই বলা যায়। তবে এটাও ঠিক, ভারত সরকার ওনাকে কোনো সাহায্যই করেনি।

পরদিন সন্ধ্যায় অনিমেষ শ্যামাপ্রসাদবাবুকে আর দেখেনি। হয়ত ঘরেই কাজ করছেন। রাত বেড়েছে অনিমেষের একটু ঢুলুনির মতো এসেছিল, হঠাৎ বাইরে হইচই শুনে ও বেরিয়ে এল। কেলেঙ্কারি কাণ্ড, উল্টোদিকে এম.এন.কৃষ্ণনের বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। বাজির থেকেই লেগেছে হয়তো। বাইরে একগাদা লোক। জলের বালতি নিয়ে ছোটাছুটি চলছে। দমকলে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেটুর থেকে আসতে আসতে কমপক্ষে আধঘন্টা। ভেতরে পুরো কৃষ্ণনের পরিবার আটকে পড়েছে। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে শ্যামাপ্রসাদবাবু বেরিয়ে এলেন,— অনিমেষ, ভেতরে কেউ আটকে পড়েছে নাকি?

—হ্যাঁ, ওদের পুরো পরিবারটাই।—বলতেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। শ্যামাপ্রসাদবাবু ছুটে আগুনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল অনিমেষ। এখানকার সবার

কাছে উনি পাগল—অথচ ওদের বিপদে উনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। এতখানি আত্মত্যাগী? এতখানি মহান?

খানিকক্ষণের মধ্যেই সবার অবাক দৃষ্টির সামনে শ্যামাপ্রসাদবাবু কৃষ্ণনের মেয়ে আর স্ত্রীকে উদ্ধার করে বেরিয়ে এলেন।

বেশ ভালরকম পুড়ে গেছে কৃষ্ণনের মেয়ে ও স্ত্রী। তাড়াতাড়ি করে অ্যাম্বুলেন্সে ওদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শ্যামাপ্রসাদবাবুও মনে হলো একটু আহত হয়েছেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে উনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে সোজা বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

দেরী না করে পিছনে পিছনে অনিমেষও ঢুকল।

—আরে অনিমেষ, এসো ভাই এসো।

—আপনি ওভাবে আগুনের ভেতরে ঢুকে গেলেন, আপনার সাহস তো না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আপনি পুড়ে যাননি তো?

—হ্যাঁ, কেউ বিপদে পড়লে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ঝাঁপিয়ে পড়ি।

—আচ্ছা, একটা কথা বলব আপনাকে? কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কিন্তু কাল আমাকে চাণক্যকে দেখাননি। আজ দেখাবেন তো? আপনি দেখান না বলেই লোকে আপনার কথা বিশ্বাস করে না।

—দেখো অনিমেষ, লোকের বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায় না। তবে তোমার যাতে আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা না হয়, তাই তোমাকে আজ আমি চাণক্যকে দেখাব। এসো অনিমেষ।

শ্যামাপ্রসাদবাবু গতকালের ওই ঘরটাতে অনিমেষকে নিয়ে ঢুকলেন। সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কালকের বাক্সটার কাছে অনিমেষকে নিয়ে

এসে দাঁড়ালেন। একটা চাবি দিয়ে বাক্সের তালা খুলে ওপরের ঢাকা খুলে ফেললেন। ভেতরে আরেকটা কাঁচের বাক্স। তাতে শুয়ে হুবহু শ্যামাপ্রসাদবাবুর মতোই দেখতে আরেকটা লোক।

—যিনি শুয়ে আছেন বাক্সের ভেতরে, উনিই হলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। আর আমি হলাম চাণক্য। ওনার হাতে তৈরি রোবট।

ভয়ে বিস্ময়ে অনিমেষ প্রশ্ন করে ওঠে, তা-তা তার মানে শ্যামাপ্রসাদবাবু বেঁচে নেই?

—না। চারবছর আগে মারা যান। আমার হাতে মারা যান। দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন—এসবই শ্যামাপ্রসাদবাবু মানিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেটা মেনে নিতে পারেননি, তা হল ওনারই দেশের লোকের ওনার কাজের প্রতি অবহেলা। উপযুক্ত স্বীকৃতির অভাব। দেশের নানান প্রতিষ্ঠানে চাণক্যকে প্রমাণ করতে উনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়েছেন, জনে জনে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওনাকে কেউ বুঝতে চায়নি, কেউ না।

শেষে যখন দেখলেন যে নিজের দেশের থেকে কোনরকম সম্মান-স্বীকৃতি বা অর্থসাহায্য পাচ্ছেন না, তখন উনি ঠিক করলেন, যে উচ্চমূল্যে আমাকে অন্যদেশের কাছে বিক্রি করে দেবেন—যারা ওঁর চাণক্যের কদর বুঝবে।

কিন্তু এখানেই উনি ভুল করলেন। ভুলে গেলেন যে ওনার লেখা প্রোগ্রাম আমাকে এমন করে তুলেছে যে আমি আমার দেশ ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেই পারি না। স্বদেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ। তাই তো আমার পরিচয়, তাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন উনি আমাকে বিদেশে পাঠাতে বদ্ধপরিকর, তখন আমি এরকমটা করতে বাধ্য

হলাম। হত্যা করলাম ওনাকে।

চাণক্য অনিমেষের সামনে এসে দাঁড়াল। ফের বলে উঠল—কিভাবে মৃত শরীরকে দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখা যায় তা উনিই শিখিয়েছিলেন। নিজের স্রষ্টাকে নিজের হাতে এ বাক্সে আমিই রেখেছি। খুব কষ্ট হয় অনিমেষ। খুব কষ্ট। রোবট হলেও চাণক্যের দুঃখ-কষ্ট-ভালোবাসা সবই আছে। আমার কাছে উনি তো সবকিছু।

একটু থেমে চাণক্য ফের বলে উঠল—তোমাকে আমি সব বলে দিলাম। কেন বলে দিলাম বল তো অনিমেষ?

অনাথবন্ধু

আলুকাবলি খেতে খেতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল। 'সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। কি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ!

প্রতিবাদ জানালাম—'রবীন্দ্রনাথ নয়, কামিনী রায়।'

'সে যাই হোক! বুঝলি ঘোচু, কে লিখেছেন তা দিয়ে কি এসে যায়! আসল কথাটা বুঝলেই হল। আমিও এই কথাটাই ভেবে ভেবে গত সাত-আটদিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অন্যের জন্য কিছুই করা হল না।'

'হ্যাঁ, সে তোমার ওই আলুকাবলি খাওয়া দেখেই বোঝা যায়।'

'যাঃ, এই ফেলে দিলাম।'—বলে বিশ্বজিৎদা চেটে খাওয়া শালপাতাটাতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর বলে উঠল—যাহোক, যা হবার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। আর একটা দিনও নষ্ট নয়। আমি একটা প্ল্যান করেছি। একটা ফ্রিস্কুল খুললে কেমন হয়? দেশের মূল সমস্যা তো অশিক্ষা। আর গরীবদের শিক্ষার সুযোগ কোথায়?

আমরা সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলাম—খুব ভালো হয়। খুব ভালো হয়। ভোম্বল বলল—'আমিও পড়াব।'

বিশ্বজিৎদা বলে উঠল—'হ্যাঁ, তুই পড়াবি না! তুই ক্লাস সিক্সে পড়াস।

এই নিয়ে তো বারতিনেক ওই ক্লাসে ফেল করলি। ক্লাস সিক্সের পড়ার ব্যাপারে তোর রীতিমতো অভিজ্ঞতা আছে বলতেই হবে।'

'আহ, তুমি এত ভোম্বলের পিছনে লাগো কেন বল তো? তুমিও তো বি.এ ফেল।'

'কিছু না জেনে বকিস না। আমার সময় বি.এ. তে ফেল না করলে লোকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত না। ইউনিয়ন লীডারও হওয়া যেত না। যে যতো বেশিবার ফেল করেছে, সে কলেজের ততো বড় সিনিয়র লীডার। দেখিস না দেশের বড়ো বড়ো মন্ত্রীদের। তা সে কথা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক্। আজ থেকে আমাদের প্রত্যেককে স্কুলের জন্য যে কোনো ধরনের আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘোচুর বাড়ির একতলায় স্কুল হবে।'

আমি আঁতকে উঠলাম—'আমার বাড়ির একতলায়—কিন্তু দিদিমা যে একতলার ঘরে...'

'থাম ঘোচু। দেশ আগে না দিদিমা আগে। দিদিমাকে বার করে দে অথবা দিদিমাকে বল আমাদের স্কুলে ভর্তি হতে।' একটু থেমে বিশ্বজিৎদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ফের বলে উঠল—'আমাদের স্কুলের নাম হবে অনাথবন্ধু। বলতো ভোম্বল, অনাথবন্ধু মানে কি?'

'কি আবার! বন্ধুদের অনাথ করা।'—ভোম্বল বলে উঠল।

বিশ্বজিৎদা সায় দিয়ে বলে উঠল—'আমরা পরশু থেকে স্কুলের ব্যাপারে লিফলেট বিলি করব।'

দুদিন পরে রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞপ্তি পড়ে গেল। 'বিনা খরচে সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করুন। অনাথবন্ধু স্কুল। শেখাবেন কৃতী ও অভিজ্ঞ ছাত্রেরা। প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র।'

ভোম্বলের মতো সুদীপ আর শান্তনুও আছে যাদের একাধিক বার

এক ক্লাসে ফেল করার অভিজ্ঞতা আছে। তাই অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু কৃতী কথাটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। তাতে বিশ্বজিৎদা একটা জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে কৃতী বলে যাদের মাঝে মধ্যে আলোচনায় ডাকা হয়, তাদের উদাহরণ দিয়ে বলে উঠল—ওরা যদি কৃতী হতে পারে, তাহলে আমরা সবাই কৃতী। আমাদের ভোম্বলও।

এর সঙ্গে সঙ্গে হাজার খানেক লিফলেটও তৈরি হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বিলি করতে শুরু করলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার আশেপাশে অজস্র লিফলেট জড়ো হল। লোকে নিচ্ছে—দেখছে—আর ফেলে দিচ্ছে। একজন উৎসাহী মহিলা একটা নিয়ে খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে আরো দুটো চাইলেন। উৎসাহে আরো তিনটে দিলাম। ওনার চেনাজানার মধ্যে বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে আছে হয়তো। কিন্তু না ওকি! খানিকদূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন উনি।

'কই-কই, দেখি সার্টের কোথায় কাকে পায়খানা করেছে?' বলে কাগজের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হলেন।

ভোম্বলের বাবা একটা জিনিসই সহ্য করতে পারেন না। তা হল সিনেমা দেখা। ভোম্বল একটা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে লিফলেট বিলি করছিল। হঠাৎ কোত্থেকে ওর বাবা এসে হাজির।

'ছিঃ ছিঃ ভোম্বল, তুই এতোটা নীচে নেমে গেছিস! সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করছিস!' —বলে হিড়হিড় করে ভোম্বলের কান টানতে টানতে কোথায় উধাও হলেন। ভোম্বল কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কানের টানে কিছুই বলতে পারল না।

লিফলেটের ভাষাটা এখনও বলা হয়নি। ওটা বলা যাক।

"মহাশয় সবিনয় নিবেদন,

অনাথবন্ধু



আমাদের 'বেপরোয়া' ক্লাবের পক্ষ থেকে অবৈতনিক স্কুল খোলা হচ্ছে। আপনাদের অশিক্ষিত ছেলেরা যাতে আপনাদের মতো অশিক্ষিত না হয় সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই এই স্কুল। এই উপলক্ষ্যে আপনারা সবান্ধবে স্কুলে উপস্থিত থেকে বাধিত করবেন।"

একজন ষন্ডামার্কা লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে দিলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল—তুমি লিখেছ?

পুরো কৃতিত্ব আমারই প্রাপ্য। একটা বিয়ের কার্ড থেকে খানিকটা ভাষা চুরি করে লিখেছিলাম। লজ্জার হাসি হেসে বিনয়ের সঙ্গে বললাম—'হ্যাঁ।'

'এক চড়ে দাঁতগুলো ফেলে দেব। আমাকে অশিক্ষিত বলা! সবান্ধবে স্কুলে ভর্তি হতে বলা! ছোঁড়া এসেছে শেখাতে!' লোকটা হাত নাড়িয়ে মুখভঙ্গি করে বলে উঠলো।

'না, আপনি অশিক্ষিত থাকতে চাইলে, সেরকমই হবে—বাধা দেব না। শুধু আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করব।' —আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

'চামড়া ছাড়িয়ে নেব মেরে।' বলে লোকটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জনা কয়েক লোক এসে আমায় উদ্ধার করল। কিন্তু ততক্ষণে আমি কয়েকটা রামচড় খেয়ে গেছি।

আমরা সবাই সন্ধেতে ফের জমায়েত হলাম। আমি গালে, ভোম্বল কানে হাত বোলাচ্ছি দেখে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল—'দেখ ভালো কাজে বাধা একটু আসে। ওতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তা আমরা কে-কোন ক্লাসে কে কোন সাবজেক্ট পড়াব সেটা একটু ঠিক করে নিই।'

একেকজনের উপর একেকটা সাবজেক্ট পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হল।

আমার উপরে অঙ্ক। দাদু, বাবা, মা প্রত্যেকেই অঙ্কে বেশ ভালো ছিলেন। আশা করা যায় উত্তরাধিকার সূত্রে আমারও অঙ্কে ভালো দখল থাকবে। হাফিয়ার্লিতে ১০০-তে ১০ পাওয়ার কথাটা আর বললাম না।

বিশ্বজিৎদা দুটো বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনেছে। স্কুলের দেওয়ালে টাঙানো হবে। একটা বিদ্যাসাগরের, অন্যটা নিজের। আমাদের কথা চলছে এর মধ্যে এক মোটাসোটা কালো মাঝবয়সী মহিলা ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে বছর আটেকের ছেলে। তার চোখেমুখে ছটফটে ভাব। রাস্তার চটি পরে ঘরে ঢুকতে বারণ করায় ছেলেটা বলে উঠল—'হাজারবার ঢুকব।' তারপর ওর মার দিকে তাকিয়ে নালিশ করল। 'মা এমন হলে আমি কিন্তু পড়ব না।' আমরা সবাই হাই-মাই করে উঠলাম। বিশ্বজিৎদা মিছরি ভেজানো গলায় বলে উঠল—'না, ভাইটু, চটি পরবে না কেন, অবশ্যই পরবে। চটি পরেই খাটে বস।'

ছেলেটা একটু শান্ত হয়ে বসে আমার খাটের উপর রাখা রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতা ছিঁড়ে নৌকা বানাতে লাগল। বিশ্বজিৎদার গদগদ ভাব। পারলে শরৎ রচনাবলীও ছেলেটার হাতে দিয়ে বসে।

'তা আপনাদের টিফিনের কি ব্যবস্থা আছে?' মহিলা গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন।

'না, আমরা তো টিফিন নিয়ে এখনো কিছু ভেবে দেখিনি।'

'কি? দেবেন না! টিফিন দেবেন না তো ও আসবে কি জন্যে? চল কালু। স্কুল খুলেছে। অথচ জানে না ফ্রি স্কুলে খাওয়াতে হয়।'

কালুকে নিয়ে মহিলা গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ঝন্ ঝন্ করে আওয়াজ হলো। কালু কাঁচের জানলার উপর ঢিল ছুড়ে লক্ষ্য পরীক্ষা করে বেরিয়ে গেছে।

পরের কদিন কয়েকজন ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেল। এদের মধ্যে আছে

শান্তি। প্রতীকদের কাজের মেয়ে। আমাদের ক্লাবের সদস্যরা বাড়ির কাজ করে দেবে এ শর্তে প্রতীকের বাবা শান্তিকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হয়েছেন। বুবলে, আমাদের ফুচকাওয়ালা ফুচুকাকুর ছেলে ভর্তি হয়েছে। বুবলেকে আমরা পড়াশোনা শিখিয়ে নষ্ট করে দিতে পারি বলে ফুচুকাকুর একটা বড় আশঙ্কা ছিল। আমরা তাকে আশ্বস্ত করেছি যে এমনভাবে পড়াব যাতে ও বড় হয়ে ফুচকাওয়ালাই হয়।

গণু আমাদের গয়লার মেয়ে। সেও অন্যতম ছাত্রী। গণুকে রাজী করাতে গিয়ে বিশ্বজিৎদাকে খুন্তির ছ্যাঁকা খেতে হয়েছে। গণুর মাকে বিশ্বজিৎদা গিয়ে বলেছিল—আপনার মেয়েকে নিতে এসেছি মাসিমা। গণুর মা যে ঐটুকু একটা কথার পরে এতখানি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। শুধু দূর থেকে দেখলাম তাগড়াই বিশ্বজিৎদা পাঁই -পাঁই করে ছুটছে আর তার পিছন পিছন গণুর মা খুন্তি হাতে। বলতে বলতে চলেছে, 'কি সাহস হতচ্ছাড়ার—বলে কিনা মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে!' —এখনকার মিডিয়া এফেক্ট। আমরা পরে অবশ্য সদুদ্দেশ্যটা বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই খুন্তি বিশ্বজিৎদার পিঠে স্থান করে নিয়েছে।

সবথেকে ভালো প্রতিক্রিয়া পেলাম লিচু বাগানের বস্তিতে। ঢুকেই ডানদিকের প্রথম বাড়িতে দেখি একজন রান্না করছেন। বিশ্বজিৎদার ঘটনার পর থেকে রান্নার সময়ে আমরা কাউকে কিছু বলতে যাই না। প্রথম বাড়ি ছেড়ে তাই দ্বিতীয় বাড়িতে ঢুকলাম। একজন মাঝবয়সী লোক দালানে বসে তেল মাখতে মাখতে জলের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করছিলেন। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যেতেই বললেন, না, চাঁদা দেব না। তারপর আমরা মিনিট পাঁচেক ধরে বোঝানোর পর উনি ভারী খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। আমাদের বাড়ির উনিশটা বাচ্চার প্রত্যেকেই

যাবে।’

শুনে আমরা তো প্রায় নাচতে শুরু করি আর কি। স্কুলের ঠিকানা, ক্লাস শুরু হওয়ার তারিখ ইত্যাদি জানিয়ে আমরা ফিরে এলাম। ফেরার পথে, ভোম্বলকে বলতে শুনলাম, ‘মিশনারীজ অব চ্যারিটিস-এর পরেই অনাথবন্ধু স্কুল।’ বিশ্বজিৎদা কঠিন উদাত্ত গলায় জানালো, ‘সামনে আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ—প্রস্তুত হ’ ভোম্বল।’

পরের সোমবার অর্থাৎ স্কুল খোলার দিন, ভোরবেলা ছটার সময়ে চোখ খুলে দেখি বিশ্বজিৎদা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবী, এক কাঁধের ওপর ভাঁজ করা চাদর। চোখে নির্মোহ দৃষ্টি। খানিক পরে নীচে নামলাম। ক্লাস দশটায় শুরু। আজকে আমরা শুধু ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের ডেকেছি। লিচুবাগান সাড়ে-নটায় এসে গেছে। শুধু এসেছে না, সঙ্গে আছে বেশ কয়েকটা ব্যাট ও বল। বাকিরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির উঠোন খেলার মাঠের চেহারা নিল।

বিশ্বজিৎদা আমাদেরকে উৎসাহিত করতে শান্তিনিকেতনের উদাহরণ দিয়ে বলল, ‘প্রকৃতির মধ্যে বসে না শেখালে বাচ্চাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। তোরা এর মধ্যেই ক্লাস শুরু কর। বিশ্বজিৎদার কথা মতো অচিন্ত্য অর্থাৎ আমাদের ক্লাস ওয়ানের বাংলার শিক্ষক বারান্দায় দাঁড়িয়েই শুরু করল, ‘অ-য় অজগর আসছে তেড়ে।’

—কেউ শুনছে না দেখে দ্বিগুন জোরে চেঁচিয়ে ফের বলে উঠল। শোনার মধ্যে উৎসাহী শ্রোতা বলতে একটা কালো কুকুর যেটা লিচুবাগান বস্তির লোকেদের সঙ্গে এসেছিল। নাম জিমি। বাকিরা সব একদমে ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে। হঠাৎ যেই না অচিন্ত্য, আমটি আমি খাব পেড়ে—বলল—কি হল বুঝলাম না—জিমি ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে অচিন্ত্যর দিকে

তেড়ে গেল—আম ভেবে কিনা জানি না। অচিন্ত্য আর জিমির রেস চারদিকের বারান্দায় বেশ খানিকক্ষণ চলল। বাকিরা এখন ক্রিকেট ছেড়ে ওদের দৌড় বেশ উৎসাহের সঙ্গে দেখছে। বেশির ভাগের সমর্থন জিমির দিকে। শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্য একটা পাইপে পা বেঁধে আছাড় খেতেই জিমি এসে অচিন্ত্যর পাশে বসল। কামড়ালো না, নখ বসালো না—শুধু জিভ দিয়ে মুখ চাটতে থাকলো। দূর থেকে বাচ্চাদেরকে একজন বলে উঠল, 'ফার্স্ট উইকেট ডাউন।'

এরপর আমার অঙ্ক করানোর পালা। বারান্দায় বোর্ড টেনে 'এক' লিখে এক বলতে বললাম। উত্তরে একটা বল সে বোর্ডে লাগল। উত্তেজিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তখনো সবাই একমনে ক্রিকেট খেলে চলেছে। কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বোর্ডটা হলো আমাদের বাউন্ডারী লাইন।' রেগে উঠে বললাম, 'না পড়লে কান ধরে বের করে দেব।'

নেতাজী কণ্ঠে বললাম, 'বল, এক'। শুনলাম 'ঘ্যাঁক'। নাঃ এবার আর চাটা নয়। অচিন্ত্যকে ছেড়ে জিমি মোক্ষমভাবে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে আমার পায়ের গোড়ালিতে। 'উঃ'—বলে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকলাম, তারপরে নার্সিংহোমে।

ফিরলাম দিন দুই পরে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বজিৎদা, চোখের নীচে কালি, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বিশ্বজিৎদা, পড়ানো কেমন চলছে? ছাত্র বেড়েছে?'

উত্তরটা অচিন্ত্য দিল। 'হ্যাঁ, বেড়েছে মানে দেখে আয়। ছাত্ররা আর বাড়ী ফিরতে চাইছে না।'

ভেতরে ঢুকে হতবাক। একি! এযে পুরো লিচুবাগান বস্তিই আমার বাড়ির উঠোনে চলে এসেছে। একধারে ক্রিকেট, একধারে তাস,

আরেকধারে জামা কাপড় শুকোনো। বাচ্চা, বুড়ো, বুড়ি কেউ বাদ নেই। রীতিমতো সবান্ধবে উপস্থিত। বিশ্বজিৎদা আমার সঙ্গেই ঢুকেছিল। ওদের উদ্দেশ্যে বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এরকম হলে সব্বাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেব।' পরক্ষণেই অবশ্য মিনমিনে গলায় বলে উঠল, 'না, না আমি সেরকম বলছিলাম না। আপনারা থাকুন। আমি-ই যাই।'

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি গোটা পাঁচেক কুকুর। জিমিরই বন্ধুবান্ধব হবে। চোখের দৃষ্টি খুব সুবিধের নয়।

বাইরে বেরিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বিশ্বজিৎদাকে বললাম, 'এ কি হল বিশ্বজিৎদা? স্কুলের জন্য শেষে ঘরছাড়া হলাম'

বিশ্বজিৎদা আশ্বস্ত করল, 'ঘর আগে না দেশ আগে?'

প্রফেসার ইয়াকোয়ার মৃত্যুরহস্য

কলকাতায় জানুয়ারি মানেই বইমেলা। আমাদের শনিবারের আসরে তাই সবার মুখেই বইমেলা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিলন বলল,—বই-এর যা দাম হচ্ছে, তাতে গল্পের বই আর কেনা যাবে না।

আমরা সবাই তাতে সায় দিলাম।

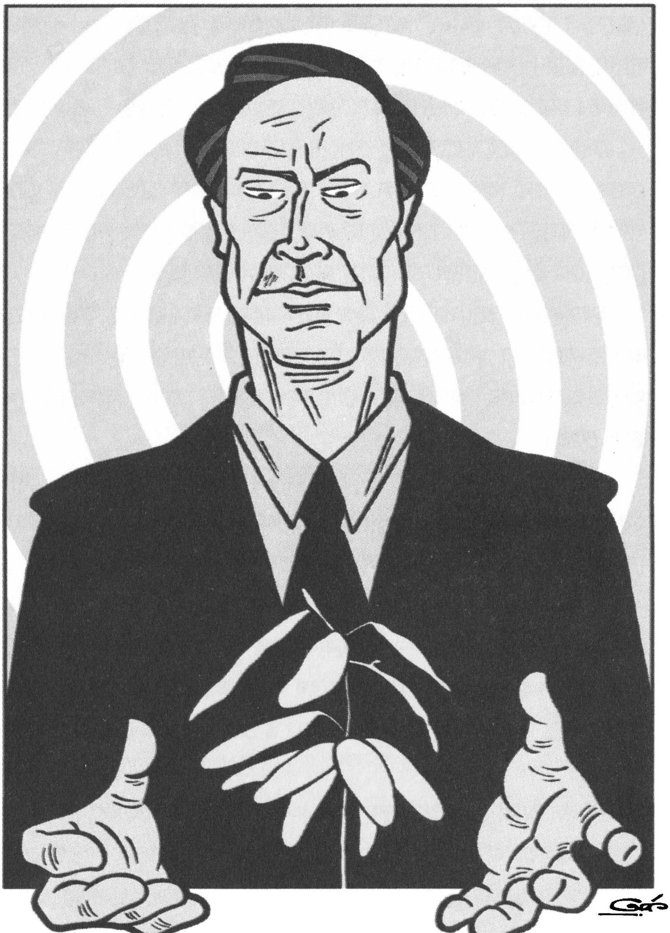
সবিতা বলে উঠল,—এক অনিলিখাদিই আমাদের ভরসা।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। অনিলিখা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বলে উঠল,—তবে, আজ আর কোনো গল্প নয়। আজ প্রফেসার ইয়াকোয়ার কথা বলব।

—প্রফেসার ইয়াকোয়া?

—সে কি! ইয়াকোয়ার নাম শুনিসনি? ইয়াকোয়া জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এ পৃথিবীর প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানী। সারা পৃথিবী ওনাকে চেনে। —অনিলিখা বলতে থাকে—ইয়াকোয়ার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় রোজারম্যানের মাধ্যমে। হার্ভার্ডে আমাদের ইকনমিক্সের ক্লাস নিতেন রোজারম্যান। ইয়াকোয়ার বাড়ি ছিল আমার

প্রফেসার ইয়াকোয়ার মৃত্যুরহস্য



হোস্টেল থেকে মিনিট পাঁচেক দূরে। ওনার বাড়িতে ছিল বিশাল ল্যাবরেটরি। কেন জানি না, আমার ওই ল্যাবরেটরিতে যেতে খুব ভাল লাগত। যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছুই বুঝতাম না, তবুও ভাল লাগত।

লোক হিসাবে ইয়াকোয়ার কোনো তুলনা হয় না। প্রচণ্ড আপনভোলা লোক। কোনো কিছুতেই লক্ষ্য নেই। শুনেছি, একবার হার্ভার্ডে পথ ভুলে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেখানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্লাস নিয়ে চলে এসেছিলেন।

ইয়াকোয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ডলসম্যান। ডলসম্যানও কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে খুবই অমায়িক। ইয়াকোয়ার সবকাজে সহকারী হিসাবে থাকত ডলসম্যান। অথচ আমি গেলেই ডলসম্যান দেখি কোথায় উধাও হয়ে যেত।

সেদিনও ইয়াকোয়ার বাড়িতে গেছি। রাত তখন আটটা হবে। দেখি ইয়াকোয়া আর ডলসম্যান খুব মনোযোগ দিয়ে একটা মাইক্রোস্কোপে ছোট টিউবের ভেতরের তরল দেখছে।

আমি 'গুড ইভিনিং' বলতেই প্রফেসার ইয়াকোয়া আমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলেন,—এটা একধরনের ব্যাকটিরিয়া যা কোনো গাছে নিজের জিন ইন্‌জেক্‌ট করে জীবনধারণ করে। আমরা এর সাহায্যে একটা দ্রবণ তৈরি করেছি, যা যে-কোনো গাছে স্প্রে করলে সেই গাছে ফুল ফুটবে।

—সে আবার কি করে সম্ভব? ঝোপঝাড়েও ফুল ফোটাবেন নাকি?

ইয়াকোয়া ঘাড় না ঘুরিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। লিফি আর অ্যাপাটেলা ওয়ান বলে দুধরনের জিন আছে, যা যে-কোনো গাছে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। এই জিন ফুল ফোটে না এমন কোনো গাছে

ঢোকালে, সে গাছেও ফুল ফুটবে। তাই আমি ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে ওই জিন গাছে ইন্‌জেক্‌ট করে দেখব। আমার পরীক্ষার গাছ কোনটা জানো তো? ওই দেখ।

বলে ইয়াকোয়া ল্যাবরেটরির এককোণে রাখা একটা গাছের চারার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

ওটার নাম সান-ডেসমোডিয়ান গাইরান্‌স—অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের টেলিগ্রাফ প্ল্যান্ট যাতে ফুল ফোটে না,—ইয়াকোয়া ফের বলে উঠলেন।

—তা আপনি এ গাছটা পছন্দ করলেন কেন?

—খুবই সেন্‌সিটিভ গাছ হওয়ার জন্য এর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য গাছের তুলনায় তাড়াতাড়ি হবে আশা করি।

ইয়াকোয়ার কথার মধ্যে চা নিয়ে বাড়ির চাকর চ্যাপম্যান ঢুকল। ইয়াকোয়া আমাকে বললেন,—যাও, চ্যাপম্যানের সঙ্গে গল্প কর।

বুঝতে পারলাম ইয়াকোয়ার কাজে অসুবিধা হচ্ছে। আমি আর কি করি, চ্যাপম্যানের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

এর দিন দশেক পরে একদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শুনি সেদিন সকালে ইয়াকোয়াকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। বিস্তারিত যা শুনলাম তা হল, কয়েকদিন আগে ইয়াকোয়ার কাছে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আসেন। ওনার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া। ইয়াকোয়া এমনিতে ডাক্তার। তাই ওনার কাছে ওই ভদ্রমহিলা এক বিশেষ অসুখের চিকিৎসার জন্য আসেন।

ভদ্রমহিলার হঠাৎ করে স্মৃতিশক্তি কমে গেছে। বুদ্ধি, চেতনা, অনুভূতিও একই সঙ্গে প্রচণ্ড মাত্রায় কমে গেছে। স্নায়ুকোষের হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যাওয়াই এর কারণ। এককথায় একে 'অ্যালজাইমার ডিজিজ'

বলে।

ইয়াকোয়া কি একটা ইঞ্জেক্‌সন দেন, এবং দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভদ্রমহিলা মারা যান। ইয়াকোয়ার ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। নেহাত অত নামকরা বিজ্ঞানী, তাই আদালত অপেক্ষাকৃত হাল্কা শাস্তি দিয়েছিল।

—কেন, ভুল চিকিৎসাতেই যে মারা গেছে তার প্রমাণ কি? ইয়াকোয়ার ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড বিনা বিচারেই ঠিক হল নাকি? —সুরজিৎ বলে ওঠে।

—না, সেটা আদালত থেকেই ঠিক হয়েছিল। ওখানে বিচার অনেক তাড়াতাড়ি হয়। তাছাড়া ইয়াকোয়া অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

পরে আমি জেলে ওনার সঙ্গে দেখা করি। উনি বলেন যে উনি দুটো সলিউশন তৈরি করেছিলেন—একটা গাছে ফুল ফোটানোর জন্য, অন্যটা ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার স্নায়ুকোষ উজ্জীবিত করার জন্য। ভুলবশতঃ দুটোর প্রয়োগ উল্টে যায়। অর্থাৎ গাছের জন্য তৈরি করা দ্রবণটা উনি ইন্‌জেক্‌ট করেন ভদ্রমহিলার শরীরে। এবং তাতেই ওঁর মৃত্যু হয়। আরেকটা জিনিস জেনেছিলাম, সলিউশন দুটো ইয়াকোয়ার হাতে ডলসম্যানই তুলে দিয়েছিল।

এর পরের ছ'মাস ইয়াকোয়ার ল্যাবরেটরিতে আমি আর যাইনি। আসল লোকই নেই, তো কার জন্য যাব?

ইয়াকোয়া ছাড়া পাবার পরের দিন আমি আবার ওনার বাড়ি যাই। আমাকে দেখেই ইয়াকোয়া স্বভাবসুলভ হাসিঠাট্টা শুরু করলেন। কথায় কথায় উনি সেই গাছের কথা তুললেন। গাছের ওপরেও তো ভুল ইঞ্জেকশান প্রয়োগ করা হয়েছিল। গাছটা কিন্তু বেঁচে গেছে। বলে উনি

আঙুল তুলে ঘরের কোণে রাখা টবটার দিকে দেখালেন।

সত্যিই, গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে। বেশ সবল, সতেজ চেহারা। পাতার রঙ লালচে সবুজ। সাত-আটটা ডাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ডলসম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ইয়াকোয়া ডেকে পাশে বসালেন।

আজ ইয়াকোয়ার কাজের ব্যস্ততা নেই। মার্ক টোয়েন থেকে শুরু করে পিকাসোর আঁকার সম্বন্ধেও আলোচনা হল। খালি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মাঝে মধ্যেই ইয়াকোয়া উঠে গিয়ে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আবার ফিরে আসছেন।

খানিকক্ষণ বাদে আমি যে প্রশ্নটা করব ভাবছিলাম, ডলসম্যানই সেটা করে বসল,—কি দেখলেন স্যার?

—এ গাছটাকে আমি আসা থেকেই লক্ষ্য করছি। ইতিমধ্যে কতকগুলো আশ্চর্য জিনিস আমার নজরে এসেছে। গাছটা কিছু আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। তোমাদের চোখে পড়েনি?

—সে আবার কিরকম?

—আমার মনে হচ্ছে গাছটার বুদ্ধি আছে। বোঝার ক্ষমতা আছে। আর সেটা এর ডাল-পাতার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। এখন গাছটা মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছে। পাতাগুলো তাই শান্তভাবে রয়েছে। খানিকক্ষণ আগে আমার কথায় তোমরা যখন হাসছিলে, তখন আমি গাছটার দিকে তাকিয়েছিলাম। অদ্ভুতভাবে ডালগুলো দুলছিল। সেতারের তারে টান দিলে যেরকম কম্পন সৃষ্টি হয়, ঠিক সেরকমই হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিল ডালের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

কালকে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে একটা ডাল ধরে মচকাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল গাছটার দিকে। সারা গায়ে যন্ত্রণার চিহ্ন। কুঁচকে ওঠা গাছের পাতায় অভিমানের ছাপ। আধমচকানো ডালটায় বেশ খানিকক্ষণ হাত বোলালাম। মনে হল গাছটা আমার ভুল বুঝতে পেরেছে।

হেসে উঠে বলে উঠলাম,—প্রফেসার, এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। আমি এ গাছে অসাধারণ কিছু—

কথা থেমে গেল গাছের দিকে চোখ পড়তে। সত্যি সত্যিই গাছের পাতায় যেন একটা তরঙ্গের ছোঁয়া।

—প্রত্যেকটা জিনিস লক্ষ্য করার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হয়।—ইয়াকোয়া একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েই বলে উঠলেন।

সেদিন আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব চলল। জেলের অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা, জেলের খাওয়াদাওয়া, কিভাবে ওখানে সময় কাটতো—সেসব নিয়ে কথা হল। আমার চোখ ছিল গাছের ওপর। টিউবলাইটের আলোয় মাঝে মাঝে দু-একটা পাতা চক্‌চক্ করা ছাড়া দেখার মতো তেমন কিছুই চোখে পড়ল না।

এরপরে আমি যখনই গেছি, প্রফেসারকে দেখতাম হয় কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, না হয় ওই গাছের পাশে বসে আছেন। মাঝে মাঝেই বলতেন,—তুমি এলে গাছটা বেশ খুশি হয়।

আমি যতটা সম্ভব গম্ভীর হয়ে ওনার কথা শুনতাম। কথার বিষয়বস্তু খালি একটাই—তা হল এ গাছ।

ডলসম্যাস ওই গাছ নিয়ে প্রফেসারের মাতামাতিটা আদৌ পছন্দ করত না। গাছের কথা উঠলেই দেখতাম ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে।

ওদিকে ইয়াকোয়া আর ইয়াকোয়ার গাছ সবার আলোচনার বিষয়বস্তু

হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসার ক্লাস নিতে না এলে ছাত্ররা বলত,—স্যার, গাছে জল দিচ্ছেন। গল্প শোনাচ্ছেন।

রাস্তায় জোরে হাঁটতে দেখলে প্রতিবেশীরা বলত—বোধ হয় গাছের ভারি খিদে পেয়েছে। উনি তাই বাজারে চলেছেন।

কথাগুলো অবশ্যই অতিরঞ্জিত, তবে এটা ঠিক যে ইয়াকোয়ার বেশির ভাগ সময়ই কাটত ওই গাছটাকে নিয়ে। আমাকে আর ডলসম্যানকে ডেকে ডেকে দেখাতেন কিভাবে গাছের পাতায় পাতায় রাগ ফুটে ওঠে, কিভাবে খুশিতে দুলে ওঠে, কিভাবে পাতা ধরে টানলে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমনকি পাশের আরেকটা গাছে জল দিলে কিভাবে এ গাছে ঈর্ষার ভাব ফুটে ওঠে, তাও উনি দেখাতেন। আমিও আশ্চর্য হয়ে তাই দেখতাম। বেশ সময় কেটে যেত।

এর কয়েকদিন বাদে ইয়াকোয়া হঠাৎ আমার হোস্টেলে এসে হাজির। মুখে চোখে উত্তেজনার চিহ্ন। ঘটনা এই যে ইয়াকোয়া ওই গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ পেয়েছেন। এ ব্যাপারে ওনার বক্তব্য, কি উদ্ভিদ—কি প্রাণী, যে কোন দুই ভিন্ন জীবের ক্রোমোজোম-সংখ্যাও ভিন্ন হতে বাধ্য। মানুষের দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬, তা আমরা সবাই জানি। কাছাকাছি ক্রোমোজোম সংখ্যার উদ্ভিদ বলতে, সোলানাম টিউবারসাম—যার ক্রোমোজোম-সংখ্যা ৪৮। আর কফি অ্যারাবিকা—যার ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৪। তাই ৪৬ ক্রোমোজোম-সংখ্যা বিশিষ্ট এই গাছ ওনার মতে বিজ্ঞানের কাছেও এক বিস্ময়। এছাড়া উনি এও বললেন যে ৪৬ ক্রোমোজোম-সংখ্যা বিশিষ্ট উদ্ভিদও যে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হবে, এতে আর আশ্চর্য কি!

—আচ্ছা অনিলিখা, গাছের ক্রোমোজোম-সংখ্যা কিভাবে গোনা

হয়? —সত্যেনদা প্রশ্ন তুলল।

—প্রফেসার ইয়াকোয়া থাকলে আমি কাল-পরশুর মধ্যে ব্যাপারটা জেনে বলতে পারতাম। এটা তো আর আমার সাবজেক্ট নয়।

—থাকলে মানে? ইয়াকোয়া মারা গেছেন বুঝি?

—হ্যা, এর কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ ইয়াকোয়া মারা যান। স্বাভাবিক মৃত্যু। যেদিন মারা যান, তার আগের দিনই ওনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি। বেশ হাসিখুশি সুস্থ দেখে এসেছি। তবে কার জীবনে কখন যে কি হয় বলা মুশকিল। তবু আমার মন মেনে নিতে পারছিল না মৃত্যুটাকে।

ইয়াকোয়ার বাড়ি গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লোক। বিশ্বের বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছে। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা— ইয়াকোয়াকে হারানো সারা বিশ্বের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ডলসম্যান ঘরের এককোণে মাথা নিচু করে বসে আছে। খুব ভেঙে পড়েছে। হাজার হোক বহুদিন ইয়াকোয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছে। ওকে সান্ত্বনা দিলাম।

ওর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় চোখ পড়ল গাছটার ওপর। এতক্ষণ গাছটার কথা ভুলেই গেছিলাম। গাছটার পাতায় পাতায় পরিষ্কার একটা মুষড়ে পড়া ভাব। গাছের পাতাগুলো যেন কিরকম রাগী রাগী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্তত ইয়াকোয়া থাকলে তো তাই বলতেন।

ডলসম্যানকে দেখালাম। ডলসম্যান আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। উঠে চলে গেল অন্য ঘরে।

আমার সামনেই বসেছিলেন মিঃ বার্টরাণ্ড। উনি বোস্টন পুলিসের একজন হর্তাকর্তা ব্যক্তি। উনি ডলসম্যানের হঠাৎ করে এভাবে উঠে

যাওয়া লক্ষ্য করেছিলেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন,—কি ব্যাপার?

আমি গাছের এই পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করলাম। ইয়াকোয়ার সূত্রে এই গাছের কথা শুনতে কেউ বাকি রাখেনি। যদিও চোখে দেখেছি শুধু আমরা তিন-চারজন।

উনি গাছের পরিবর্তনটা দেখাতে বললেন। দেখাতে গিয়েই দেখলাম, গাছের পাতাগুলো আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। আমি কিছু বলে ওঠার আগেই দেখি গাছের পাতাগুলো ফের সামনের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। ডগার দিকটা ছুঁচোলো হয়ে উঠেছে। রেগে যাওয়ার ছাপ। মাথা ঘুরিয়ে দেখি ডলসম্যান ঘরে ঢুকছে। নেহাতই ইয়ার্কি ছলে বলে উঠলাম,—কি হে ডলসম্যান, তোমাকে দেখলেই যে গাছটা বেঁকে বসছে, কিছু অপকর্ম করেছ নাকি?

কথাটা আমি হাল্কাভাবেই বলেছিলাম। কিন্তু ডলসম্যান দেখি গর্জে উঠল,—ইউ আর এ লায়ার। গাছের এরকম পরিবর্তন মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। রেগে যাওয়া, মুষড়ে পড়া, খুশি হওয়া—এ সব আষাঢ়ে গল্প। তুমি আর এ বুড়োটা প্রত্যেককে বোকা বানিয়ে এসেছ। একটা সাধারণ গাছকে অসাধারণ করে তুলেছ।

এরকম আচমকা চেঁচামেচি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডলসম্যান। পিছু পিছু দেখলাম বার্টরাণ্ড ও বেরিয়ে গেল।

এতটা বলার পর অনিলিখা উঠে দাঁড়াল,—এবার বাড়ি যেতে হবে।

আমরা সবাই হইচই করে উঠলাম—গল্পই তো শেষ হল না!

একেবারে ক্লাইম্যাক্সে এসে হঠাৎ করে ইতি টানার প্রবণতা আগেও অনিলিখার মধ্যে দেখেছি। তাই আমরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম,—তারপর?

—বাকি যেটা বলব, সেটা নিশ্চয়ই তোরা অনুমান করে নিয়েছিস। তার পরেরদিন আমিও সেই খবরটাই শুনলাম, যেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ডলসম্যানের হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠা বার্টরাণ্ডের মতো অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারের চোখ এড়ায়নি।

সেদিন সন্দেহের বশে বার্টরাণ্ড ডলসম্যানকে জেরা করতে নিয়ে যায়। লাই ডিটেক্টরের সামনে ডলসম্যান স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ইয়াকোয়ার মূল্যবান রিসার্চ পেপার হাতানোর জন্য ডলসম্যান ইয়াকোয়াকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। ডলসম্যানকে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে হত্যা করেছিল। এমনকি একটা বিশেষ ইঞ্জেকশনও পরে দিয়েছিল, যাতে শ্বাসরোধে মৃত্যু বলে মনে না হয়। কিন্তু একটা সাক্ষ্য ওর অলক্ষ্যে রয়ে গিয়েছিল। তা হল ইয়াকোয়ার ওই গাছটা—সান-ডেসমোডিয়াম গাইরানস।

এতটা বলার পর পাশের টেবিল রাখা জলের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে অনিলিখা উঠে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, ওই গাছটার কী হল?—মিলন আমার প্রশ্নটাই তুলল।

মুচকি হেসে অনিলিখা বলে,—আশা করি, গাছটা এখনও আছে।

—তা, ওইরকম অসাধারণ গাছ নিয়ে হইচই পড়েনি?

—না।

—কেন?

অনিলিখা একইরকম মুখে বলে ওঠে,—ডলসম্যানের কথাই ঠিক। পরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গাছটার মধ্যে কোনরকম বিশেষত্বই ছিল না। হ্যাঁ ডাল-পাতার মধ্যে কিছু সময় অন্তর পরিবর্তন হতো বটে, তবে সেটা যে কোন সান ডেসমোডিয়াম গাইরানসেই হয়। ইয়াকোয়ার মতো

প্রতিভাবান ও পণ্ডিত লোক গাছটাকে কেন যে ওভাবে দেখেছিলেন বা আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার মনে হয় উনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘরে আরেকটা প্রাণের অস্তিত্বকে তৈরি করেছিলেন, যার ওপর ভরসা করা যায়। উনি চাইছিলেন, এমন কারো সঙ্গ, যার বোধ আছে, বুদ্ধি আছে—যার কোন ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকার ক্ষমতা আছে।

পার্কের সেই লোকটা

লোকটাকে দেখেই মনে হচ্ছিল স্বাভাবিক নয়। গালভরা সাদা খোঁচা খোঁচা অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি। মাথাভরা টাক। তার মধ্যে দ্বীপের মতো ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা চুলের গোছা। এ ধরনের চুলের প্যাটার্ন বড় একটা দেখা যায় না। কালো প্যান্টের ওপরে একটা সাদা-কালো ডোরাকাটা নোংরা হাফশার্ট। তার উপরের দুটো বোতাম আবার নেই। বয়স পঞ্চাশের কাছে পিঠে হবে। অন্তত দেখে তো তাই মনে হয়।

তবু কী যেন ছিল চেহারাতে। আর তাই বারবার আড়চোখে পাশেই বসে থাকা লোকটাকে দেখছিলাম। দেখেই মনে হয় সম্ভ্রান্ত কোনো পরিবারের। আর তারই আভাস মিলছিল চশমার কাচে ঢাকা দু'চোখের সুদীপ্ত চাহনিতে। পায়ের উপরে পা তুলে বসার অনায়াস ভঙ্গিতে। বুক-পকেটে রাখা দামি ফাউন্টেন পেনে।

আমরা একটা পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছিলাম। সামনেই একটা বড় লেক। তাতে বেশ কয়েকটা হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের সামনের রাস্তাটা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ

পার্কের সেই লোকটা



লেকের ধার দিয়ে এগিয়ে গেছে। অন্যটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে। লোকটা ওইদিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে সামনের লেকের দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ চোখাচোখি হল। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মুখটা ঘোরাতে যাব, লোকটা বলে উঠল—দেখলে মজাটা! এমনভাবে বলল যেন আমাকে বহুদিন ধরে চেনে।

—মজাটা!—আমি চমকে উঠলাম। আমি যে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি তা টের পেয়েছে নাকি? অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললাম, কি, আমাকে বলছেন?

—নয়তো কি, ওই গাছের পাখিগুলোকে বলছি? খেয়াল করেছ—যতজন এখানে দিয়ে যাচ্ছে তার পাঁচভাগের একভাগ বাঁদিকের পথটা দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাকি চারভাগ ডানদিকে লেকের ধারের পথটা ধরছে। প্রতিঘণ্টায় গড়ে একশো থেকে দেড়শো লোক আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু ওই ভাগাভাগিটা হিসাব করে দেখবে—একই থাকছে।

—তাই? খেয়াল করিনি তো! তা আপনি কখন থেকে দেখছেন?

—সকাল ছটা থেকে।

—মানে? গত বারো ঘণ্টা আপনি এখানেই বসে আছেন?

—হ্যাঁ। উঠতে পারছি না। হিসেব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। তবে এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। প্যাটার্নটা নির্ভুল।

—শুধু এটা জানার জন্যই বসে আছেন? জেনে লাভ?

লোকটা আমার দিকে ঘুরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে এক্ষুণি কাউকে খুন করে ধরা পড়েছি।

—প্যাটার্ন। প্যাটার্নই তো জীবন। আর সেটাই যদি আমরা লক্ষ্য না করি তাহলে বেঁচে কী লাভ? এই—এই যে রোজ সকালে সূর্য উঠছে—সূর্য ডুবছে। চাঁদ উঠছে—চাঁদ ডুবছে। জোয়ার-ভাঁটা হচ্ছে। আকাশের

তারাগুলো প্রত্যেক বছর ঘুরে-ফিরে বারবার এক জায়গায় আসছে। সবকিছুর মধ্যেই একটা প্যাটার্ন আছে। আর এসব থেকে প্রশ্ন উঠেছিল বলেই না মানুষ আজ অন্য জীবজন্তুর থেকে অন্যরকম। তা না হলে আমাদেরকে কুকুর-বেড়ালের থেকে আলাদা করা যেত না।

আমি বেশ লজ্জা পেলাম। কারণ—খানিক দূরে দাঁড়ানো একটা কুকুর এসব কিছুই না বুঝে আমাকে দেখে যেভাবে লেজ দোলাচ্ছিল, আমার মনে হল আমিও ওর দলে।

তবু আত্মপক্ষ সমর্থন করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলাম,—তা, সেসব না হয় বুঝলাম। কিন্তু লোকেরা কোন পথে যাচ্ছে, তা দেখে কী বোঝার আছে?

লোকটা এবার একটু শান্তভাবে আস্তে আস্তে বলে উঠল,—হ্যাঁ, সবসময় প্যাটার্ন থেকে ইমিডিয়েটলি কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু আবার অনেক সময় প্যাটার্নের মধ্যেই অনেক জটিল রহস্য লুকিয়ে থাকে। আর সেটা বের করতে পারলেই হল। এই—এই যে সামনের গাছটা দেখছ, এর বড় ডাল আর ছোট ডালগুলো লক্ষ করো। দেখবে এরা যে অনুপাতে আছে তা এ জায়গার এক স্কোয়ার মাইলের মধ্যে বড় গাছ আর ছোট গাছের যে রেশিও—তার সঙ্গে মিলে যাবে। কী অবাক ব্যাপার, তাই না? তা, এর অর্থ কী বুঝলে? প্রকৃতিও সবসময় নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে কাজ করে। ফুলের পাপড়ি, গাছের পাতা, পাহাড়ের গড়ন, প্রজাপতির রঙ—সবেতেই প্যাটার্ন। একটা নির্দিষ্ট ডিজাইন যেন ঘুরে-ফিরে আসছে।

সত্যিই আমার লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। কথার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার থেকে বরং সামনের কুকুরটাকে দেখা ভালো। লেজ নাড়ছে —কারণ আমার হাতে একটা

আধখোলা বিস্কুটের প্যাকেট। তু-তু করে ডাকলাম। কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। আমি একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলাম।-কুকুরটা পরম তৃপ্তিতে খেতে শুরু করল। কোনো জটিলতা নেই।

— কী ভাবছ? এর মধ্যে কোনো প্যাটার্ন নেই? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটা ফের বলে উঠল,—খুব সহজ-সরল ব্যাপার তাই তো? কুকুরটা এতক্ষণ এখানে ছিল না। ঠিক এই সময়ে এখানে রোজ এ আসে কেন বলো তো? নির্ঘাৎ তোমার মতো লোকেরা এই সময়ে এসে বেঞ্চিতে বসে কিছু না কিছু খায়। আজ তুমি, কাল আরেকজন কেউ। এটাও একটা প্যাটার্ন।

নাহ্, এবার অন্য বেঞ্চে গিয়ে বসতে হবে। লোকটা পাগল করে ছাড়বে দেখছি।

আমার বিরক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লোকটা বলতে থাকল,— এক্ষুণি দেখবে ওই সামনের গাছে দুটো শালিক উড়ে এসে বসবে। সাত-আটবার ডাকবে। তারপর উড়ে পাশের গাছে চলে যাবে।

কথাটা শেষ হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক সেটাই ঘটল। দুটো শালিক উড়ে এসে পাশাপাশি দুটো ডালে বসল। গুনে গুনে দেখলাম ঠিক সাতবার ডাকল। তারপর আবার কোথায় উড়ে চলে গেল।

—সবাই নিয়ম মেনে চলে। আমরাই শুধু লক্ষ করি না। অবশ্য লক্ষ করলেই যে সব সমস্যা মিটে যায় তা নয়। —লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চশমাটা খুলে কোলের উপর রাখল। চোখ বুজে মুখটা আকাশের দিকে তুলে যেন কী চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ। আমার কেন জানি না মনে হল লোকটা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—আপনি কিছু বলছিলেন? —কৌতূহল না সামলাতে পেরে বলে উঠি।

হুঁ, বলে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। যেন অন্য কোনো জগতে হারিয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল,—নাম দিয়েছিলাম সানি। ভারী দুষ্টু ছিল। সারাক্ষণ মাকে বিরক্ত করে বেড়াত। আর মা বকলে আমার কাছে এসে নালিশ করত। ওর যখন আট বছর বয়স—একদিন বাইরে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে ফিরে এল। ওর বাঁ-পাটা অবশ লাগছে। ভাবলাম কী আর হবে? ডাক্তারের কাছে গেলাম। কয়েকটা ওষুধ দিয়ে আবার কয়েকদিন বাদে দেখাতে বলল। কিন্তু ওষুধে কাজ হল না। এরকম বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটল। কোনো উন্নতি না দেখে ডাক্তার বদলালাম। তাতেও কিছু হল না। বেশ কয়েকজন ডাক্তার দেখালাম। কিন্তু কোথাও ঠিক চিকিৎসার সন্ধান পেলাম না। ওরা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। আস্তে আস্তে শুধু বাঁ-পা নয়, ডান পায়ের জোরও কমে আসতে লাগল। ওর বাইরে যাওয়া—খেলাধুলা সব বন্ধ হয়ে গেল। হুইল চেয়ার হল সঙ্গী।

এরপর বাঁ হাত। একদিন সকালে হঠাৎ খেয়াল করলাম বাঁ হাতটাও ও আর নাড়াতে পারছে না। ঐরকম সময়েই আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরিন্দম আমেরিকা থেকে কলকাতা এসেছিল। ও খুব নামকরা সায়েন্টিস্ট। জিনের গঠন নিয়ে তখন আমেরিকায় অনেক গবেষণা চলছে। ও ছিল ওরকমই একটা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। সালটা ২০০৭, জুলাই মাস।

অরিন্দম আমার বাড়িতে এল। সানিকে দেখে ও একটু গম্ভীর হয়ে গেল। ওই বলেছিল সানির জেনেটিক টেস্ট করার কথা। অরিন্দমেরই সাহায্যে ওর জিনের পুরো ম্যাপিং করা হল। জিন ম্যাপিং তো এখন খুবই

প্রচলিত। তখন আমরা কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে অতটা জানতাম না। টেস্টে প্রমাণিত হয়ে গেল যে ওর একটা বিশেষ জিনগত দোষ আছে। একটা জায়গায় বেস কেমিক্যাল TACG-র জায়গায় CATG হয়ে বসে আছে। শুধু একটা জায়গায়—ভাবো! বিধাতা এমন একটা প্যাটার্ন ওর জিনে তৈরি করে দিয়েছেন যা পাল্টানো যাবে না। আর যাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা থাকে তারা কেউ কুড়ি বছরের বেশি এই পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গ উপভোগ করতে পারে না। কারণ আস্তে আস্তে মাংসপেশীগুলো হাল ছেড়ে দেয়। একটার পর একটা। আজ এ রিটায়ার করছে, তো কাল ও। অকালে—লোকটা থেমে গেল।

গাছের থেকে ঝরে পড়া একটা হলুদ ফুল কুড়িয়ে নিয়ে লোকটা ফের বলে উঠল, ও চলে গেল। শেষ দিনেও আমার পাশে শুয়েছিল।

সে রাতটার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার মনে আছে। ওর ডানপাশে আমি ছিলাম, আর অন্যপাশে ওর মা। ডাক্তার আগেই বলে দিয়েছিল যে রাতটা কাটবে না। ওর নিশ্চল ডান হাতটা ছিল আমার বুকের উপরে। ওর হাতের নাড়ির প্রত্যেকটা স্পন্দন আমার বুকে অনুরণন তুলছিল। বলছিল প্রত্যেকটা মুহূর্ত কত দামি। বারবার আলো জ্বেলে ওর চোখে চোখ রাখছিলাম—আলো নেভেনি তো? নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তবু সেই শিশুর জেদ। ঠোঁটটা অল্প অল্প নড়ছিল। যেন বলছিল, বাবা, আমি যেতে চাই না। আমি থাকতে চাই। বাবা, আমি বাঁচতে চাই, আমাকে তোমায় বাঁচাতেই হবে। তুমিই না বলেছিলে আমি আর তুমি নাকি জঙ্গলে যাব। আর হরুদাকে দেখিয়ে মজা করে বলেছিলে, সানি, তুই যে রোবটটা বানাবি সেটা যেন হরুর থেকেও ভালো চা করে। বলোনি বাবা! ওর ঠোঁট একটু একটু নড়ছিল। তাতে কোনো শব্দ ছিল না। কিন্তু ওর সব কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম—স্পষ্ট।

পার্কের সেই লোকটা

ভোর হল। কিন্তু রাত কাটল না। ওর নিস্পন্দ হাতটা ধরে বুকের উপর রেখে সেদিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওর মতো যত শিশু আছে, তাদের সবার পাশে আমি থাকব। ওদের জন্য একটা খেলাঘর বানাব। জীবনের সামান্য কয়েকটা দিন যেন ওরা আনন্দে কাটায়। আর চ্যালেঞ্জ জানাব বিধাতাকে—তোমার প্যাটার্ন ফিরিয়ে নাও ঠাকুর, ফিরিয়ে নাও।

শেষের সেনটেন্স দুটো বলার সময় লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে চমকে উঠলাম। তারপর দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমি পারিনি। আজও কেউ—কেউ পারেনি। তাই যখনই আমার খেলাঘর থেকে একজন সদস্য কমে যায়, এখানে এসে বসি। প্যাটার্ন দেখি—প্রকৃতির প্যাটার্ন। মনটাকে শান্ত করি। প্যাটার্ন কেউ বদলাতে পারবে না। এটাই নিয়ম।

হাল্কা হাওয়ায় উপরের গাছ থেকে বেশ কিছু হলুদ ফুল আমাদের চারদিকে ঝরে পড়ল। লোকটা উঠে গিয়ে পরম স্নেহে একটার পর একটা ঝরে পড়া ফুল কুড়োতে থাকল। সযত্নে মুঠো ভরে এনে বেঞ্চের উপর রাখল। আবার কুড়োতে শুরু করল—যেন একটা ফুলও গাছের তলায় পড়ে থাকলে চলবে না।

মনটা ভারী হয়ে এসেছিল। লোকটাকে কিছু না বলেই উঠে পড়লাম। আর কোনোদিন ওই পার্কে যাইনি। যদি দেখা হয়ে যায়। কিন্তু লোকটাকে ভুলিনি।

পাঁচ বছর পরের কথা। সকালের খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে গিয়ে তৃতীয় পাতায় লোকটার ছবি দেখে চমকে উঠলাম। খবরটার হেডলাইন—'দ্য সায়েন্টিস্ট হু আলটিমেটলি ব্রোক দ্য প্যাটার্ন।'

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম খবরটা। বাইশ বছরের সাধনার পরে

শেষমেশ এক দূরারোগ্য মাংসপেশীর অসুখের চিকিৎসার সন্ধান দিতে পেরেছেন বিজ্ঞানী নিখিলবাবু। তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধ জিনের গঠনে পরিবর্তন এনে বেশ কয়েকটি অসুস্থ শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পেরেছে। ওষুধের নাম দিয়েছেন—'সানি'।



আমরা নেই

১২ সেপ্টেম্বর ২০১০, লা রিন্‌কোনাডা, পেরু। রোজমেরী স্যান্‌চেজের বয়স মোটে নয়। তবু এরমধ্যেই ওর হাতের তালুর উপর দিকটা পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। আন্দেজ পর্বতমালার চড়া রোদে রোজ এগারো ঘণ্টা কাজ করার ফল। তবে না করেই বা উপায় কি? ওকে যে ফের স্কুলে ভর্তি হতে হবে। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। বেশিরভাগ বন্ধু আজও স্কুলে যায়। আর রোজমেরী?

রোজমেরীর কাজ সোনার খনি থেকে বাতিল করা পাথরের টুকরো ভেঙে সোনা খোঁজা। যদি কোথাও কোনো সোনা থেকে থাকে। ও তাই ভারী হাতুড়ি দিয়ে পাথরগুলোকে আরও ছোট ছোট করে গুঁড়ো করে সোনার নাগেট খোঁজে। গত বছর একবার দু'গ্রাম সোনা পেয়েছিল রোজমেরী। ফের যদি ওরকম মেলে। মাত্র চারগ্রাম সোনা হলেই হল। একবছরের জন্য স্কুল যাওয়া নিশ্চিন্ত।

ওর বাবাও লা রিন্‌কোনাডার সোনার খনিতে কাজ করত। ছোট একটা মাইনিং কোম্পানির হয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন খনির মধ্যে বিস্ফোরণে ওর ডান হাত আর পা উড়ে যায়। খনিতে যারা কাজ করে তাদের অনেকেরই এই অবস্থা হয়। অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের জন্য। ফল একটাই। মৃত্যু বা একেবারে অকেজো হয়ে যাওয়া। তাই তো ওরা বলে, 'আল লেবোর মে ডয়, নো সে সি ভলভেয়ার'। 'কাজে যাচ্ছি, জানি না ফিরব কিনা!'

আমরা নেই

সেদিনও রোজমেরী রোজকার মতন পাথর গুঁড়ো করছিল। সোনার কথা ভাবলে ভারী হাতুড়ি তুলতে একটু কম কষ্ট হয়। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে সোনা না পেয়ে হাতুড়ির ওজন যেন দ্বিগুন হয়ে গেছে। ১৭,০০০ ফুট উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেন অতি সামান্য। তাই একটুতেই যেন দম আটকে আসে। তবু থামলে চলবে না। আবার সজোরে হাতুড়ি বসায় রোজমেরী।

ঠং—ধাতব একটা শব্দ। পাথরটা দু'টুকরো হতেই ধাতব শব্দটার কারণ বুঝল রোজমেরী। অদ্ভুত চকচকে একটা জিনিস পাথরের মধ্যে গাঁথা। কিন্তু সোনা নয়। সাবধানে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে চকচকে জিনিসটাকে পাথর থেকে বার করে আনল রোজমেরী। একটা ধাতব বাক্স। বাক্সটার উপরে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে অদ্ভুত এক লাল আভা। ঐ জায়গাটায় হাত রাখল রোজমেরী। হাত রাখা মাত্র লাল আভাটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হতে শুরু করল। জায়গাটাও সামান্য গরম হয়ে উঠল। রঙটা এবার লাল থেকে বদলে বেগুনি হতে শুরু করল। বেগুনি থেকে নীল, নীল থেকে হলুদ। রঙ ক্রমাগত বদলাতে থাকল। এক অজানা শক্তি রোজমেরীকে আচ্ছন্ন করল। ও অবাক হয়ে বাক্সটার উপর হাত রেখে বসে রইল। কেন জানি ওর মনে হল নিজের উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একটা অজানা যন্ত্র যেন ওকে গ্রাস করছে। মনের গভীরে অনেক দূর থেকে কে যেন ওর সঙ্গে কথা বলছে। কনকনে বাতাসের ফিসফিসানির থেকেও স্পষ্ট যেন সে আওয়াজ।

১৩ জুলাই ২০১৯, বোল্ডার, কলোরাডো, আমেরিকা

বোল্ডার হল ইউনিভার্সিটির শহর। রকি মাউন্টেনের পায়ের কাছে ছবির মতো এই শহর। কলোরাডো ইউনিভার্সিটির জন্য হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বাস। শহরের কেন্দ্রে পার্লস্ট্রিট মল। মল বলতে অবশ্য লাল

ইট বাঁধানো রাস্তার দু'দিকে সার দিয়ে দোকান, ক্যাফে চারটে ব্লক জুড়ে মল। মলের একপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। রকি মাউন্টেন যেন মলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লাল রঙের রাজকীয় পোশাকে। বোল্ডারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এখানকার ঝকঝকে মেঘমুক্ত সকাল। বছরের মধ্যে তিনশো দিনেরও বেশি মেঘমুক্ত রোদ ঝলমলে আকাশ। তা আজ সেরকমই এক সকাল।

শনিবারের দুপুর। পার্লস্ট্রিট মলের রাস্তার বেজায় ভিড়। রাস্তায় মাঝে-মধ্যে কলাকুশলীরা দাঁড়িয়ে নানান ধরনের শো করছে। কোথাও মুখোশ পরা আর্টিস্ট নেচে নেচে বেহালা বাজাচ্ছে, তো কোথাও আগুন নিয়ে খেলা। ইঁট-বাঁধানো রাস্তায় তাই মাঝে মাঝেই জটলা। শো দেখতে লোকের ভিড়। এছাড়া রাস্তায় একটু বাদে বাদেই পাতা বসার বেঞ্চ। সেখানে বসে কোথাও কেউ নির্বিচারে চুরুট খাচ্ছে, তো কোথাও দুজনে বসে দাবা খেলছে। সেরকমই একটা ফাঁকা বেঞ্চে একা বসে আছে বছর সতেরোর একটি মেয়ে। চেহারাতে ল্যাটিন আমেরিকার ছাপ। ছোটখাটো, গোলগাল চেহারা, চাপা রঙ, উজ্জ্বল চোখ। হাতে একটা ছোট ল্যাপটপ নিয়ে কী যেন ভাবছে। আশপাশে কী হচ্ছে, কারা যাচ্ছে কোনো কিছুতেই যেন নজর নেই।

অনেকেই কিন্তু একে চেনে। রোজমেরী স্যান্চেজ। কলোরাডো ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশানাল স্পেস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারে মাত্র সতেরো বছর বয়সে কাজ করছে। এরমধ্যেই তেরোটা বড় বড় আবিষ্কার, অজস্র রিসার্চ পেপার। বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিভা বলে স্বীকৃত।

পেরুর অজানা-অচেনা একটা গ্রাম থেকে সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা—স্বপ্নের মতো উত্থান রোজমেরীর, এক হতদরিদ্র পরিবারের

সন্তান। মাত্র এগারো বছর বয়সে পেরুর ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চে প্রথম। বারো বছর বয়সে কৃত্রিম স্যাটেলাইটের উপর সৌরশক্তির প্রভাব নিয়ে রোজমেরীর গবেষণা সারা বিশ্বে হইচই ফেলে দেয়। পনেরো বছর বয়সে আমেরিকা সরকারের বিশেষ স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকা পাড়ি দেয় রোজমেরী। তারপর থেকে আমেরিকায় কলোরাডো স্টেটের বোল্ডারেই থাকে রোজমেরী। রোজমেরীর আত্মীয়-পরিজন, মা-বাবা সবাই হল বিজ্ঞানী। ওর সতীর্থরা বলে মাঝরাতেও নাকি ওকে দেখা যায় ল্যাবে বসে কাজ করতে। ওর নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্র থেকে বিভিন্ন তারায় সিগন্যাল পাঠায়।

'রোজমেরী!'

হঠাৎ লসনের ডাকে চমকে ওঠে রোজমেরী। লসন ওর থেকে বয়সে অনেক বড়। রিসার্চ সেন্টারে একই সঙ্গে কাজ করে।

লসন ফের বলে ওঠে, 'প্রফেসার রেনো তোমাকে খুঁজছিলেন। তোমার ফোনটা সুইচ্‌ড অফ আছে। ইমিডিয়েটলি ফোন করো। মনে হল খুব আর্জেন্ট।'

রোজমেরী মাথা নেড়ে 'ও কে' জানালেও লসন চলে যাওয়ার পরেও চুপচাপ বসে রইল, কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে। এই হালকা রোদ, পাহাড় থেকে নেমে আসা মিষ্টি হাওয়া, চারিদিকের উৎসব-আনন্দের ছোঁয়া—কোনো কিছুই রোজমেরীর মুখের বিষণ্ণতা দূর করতে পারল না।

ওর মাথায় শুধু একটাই প্রশ্ন, উত্তর কেন আসছে না? প্রক্সি সেঞ্চুরি তো ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে। ওর পাঠানো প্রথম মেসেজ তো প্রায় সাড়ে চার বছর আগে প্রক্সিয়ানদের কাছে পৌঁছেছে। ওদের উত্তর তো ইতিমধ্যেই চলে আসার কথা। তাহলে কি ওর গণনায় ভুল আছে? ওর

ক্যালকুলেশন অনুযায়ী পৃথিবী থেকে ওদের গ্রহের দূরত্ব ৪.৩২৩৪ আলোকবর্ষ। নাহ্ আরেকবার পুরোটা ভেরিফাই করা দরকার।

রাস্তার দিকে নজর ফেরাল রোজমেরী। দলে দলে লোক গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছে। রাস্তার মাঝে একটা জায়গায় ফোয়ারা। গানের তালে তালে জল নাচছে আর তার মধ্যে বাচ্চারা। ছন্দ আর জ্যামিতির নক্সাটুকু বাদ দিলে বাকিটা পুরোই অর্থহীন। এভাবে জল নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়। এখানে মানুষ এত জল পায় বলে জলের মূল্য বোঝে না।

অথচ ওদের গ্রহে। সামান্য একটু জলের জন্য কত হাহাকার। বড়লোকেরা আকাশছোঁয়া দামে জল কিনে নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখে দেয়। গরিবেরা পানীয় জলও ঠিকমতো পায় না। জলের জন্য ঘরে-ঘরে ঝগড়া—এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ। যে দেশের যত বেশি জল, সে দেশ তত ধনী। তাই তো ওরা বেরিয়েছিল অন্য গ্রহের সন্ধানে, যেখানে জল আছে—বসতি গড়া যায়। এখন কি ওরা জলের ক্রাইসিস অ্যাভয়েড করতে পেরেছে? কে জানে?

ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রোজমেরী। এক এক ফোঁটা জল—এক একটা প্রাণ বাঁচাতে পারে। কিছু জল যদি ওদের গ্রহে নিয়ে যাওয়া যেত।

রোজমেরীর প্রলম্বিত ছায়াটা হারিয়ে যায় ভেসে যাওয়া এক ফালি মেঘের ছায়ায়। আর ওর মন হারিয়ে যায় দূরের এক তারায়।

১৪ জুলাই, ২০১৯, বোল্ডার

রোজকার মতো রোজমেরী ওর ল্যাপটপ থেকে ফের মেসেজ পাঠাতে শুরু করল। মাঝরাত। পাহাড়ি শহরে এসময় সাধারণত কেউ জেগে থাকে না। তাই এটাই কাজের সবথেকে ভালো সময়। হঠাৎ ল্যাবের রিসিভিং স্টেশনের কম্পিউটারটা আওয়াজ করে উঠল। বিপ্

বিপ্। মেসেজ আসছে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ, ৪.২৩ মিলিমিটারে। প্রক্সি সেঞ্চুরি থেকে। টেলিস্কোপের অভিমুখ দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল রোজমেরী। হ্যাঁ, প্রক্সি সেঞ্চুরি তারা থেকেই আসছে। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রোজমেরীর।

ল্যাবের ঘরে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন ল্যাব-ডিরেক্টার রেনো। সঙ্গে আরও দুজন। রিসিভিং স্টেশন থেকে এদের কাছেও ফোনে অটোমেটেড কল গেছে। বিরক্ত হলেও রোজমেরী চুপ করে থাকে। এমনিতেও এরা মেসেজ ডি-কোড করতে পারবে না। শুধু রোজমেরীর পক্ষেই সেটা বোঝা সম্ভব।

কম্পিউটারে লেখা ফুটে উঠছে। এ কি! রোজমেরী চেয়ারে বসে পড়ে। ওর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। ঘরের অন্য কেউ না বুঝলেও রোজমেরী প্রক্সি সেঞ্চুরির মেসেজটা পড়েছে। তাতে শুধু দুটো শব্দ— 'আমরা নেই।'

রোজমেরীর মাথার মধ্যে কথাটা বারবার বাজতে থাকে—আমরা নেই... আমরা নেই। ওর নিজের বলতে তাহলে কেউ নেই!

বহুদূর থেকে প্রফেসার রেনোর কথা ভেসে আসে, 'রোজমেরী, রোজমেরী! শরীর কি খারাপ লাগছে?'

১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বোল্ডার

ওভাল শেপের টেবিলে বসে আছেন স্পেস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চের তিনজন বিজ্ঞানী। তাঁদের সঙ্গে সারা বিশ্বের আরও পাঁচজন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। সঙ্গে ডাক্তার কেমওয়েল আর আমেরিকার সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার জন।

স্পেস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চের ডিরেক্টর ডঃ রেনোই বলতে শুরু করলেন, 'আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল রোজমেরীর পাঠানো

মেসেজগুলো দেখে। প্রথমে মেসেজের অর্থ না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম সেগুলো শুধু প্রক্সি সেঞ্চুরির তারার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। আমরা যখন কোনো সিগন্যাল পাঠাই তা সবসময় নির্দিষ্ট কোনো তারার দিকে পাঠানো হয় না। প্রাণের সম্ভাবনা আছে এরকম সব তারাতেই সিগন্যাল পাঠাই।'

'প্রক্সি সেঞ্চুরির সঙ্গে রোজমেরীর সম্পর্ক?'

'সেটা বলার আগে আমি ডাক্তার কেমওয়েলকে বলতে বলব রোজমেরীর মৃতদেহ থেকে কী পাওয়া গেছে—তা জানাতে।'

কেমওয়েল বলতে শুরু করলেন, 'রোজমেরী সাধারণ মানুষ ছিল না। শি ওয়াজ লাইক এ রোবট। ওর ব্রেন পরিচালিত করত যন্ত্র। সিলিকন চিপ। তাই মানুষ হয়েও ও ছিল অ্যাকচুয়ালি রোবট। ওর হাতে একটা চিপ বসানো ছিল। আর তারই নির্দেশ শুনে কাজ করত ওর ব্রেন। তবে এই চিপটা খুব সাধারণ চিপ ছিল না। আমরা এটা অ্যানালিসিসের জন্য ইনটেলের অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টারে পাঠাই।'

ডঃ রেনো পাশ থেকে বলে ওঠেন, 'আর সেখানেই জানতে পারি যে চিপটা পৃথিবীতে তৈরী হয়নি। ইনফ্যাক্ট আমরা আগামী পঞ্চাশ বছরেও এরকম চিপ বানাতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'কী আছে স্পেশাল এই চিপে?'

'এই চিপ শুধু ব্রেনকে কম্যান্ড দেয় না, ব্রেনকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলে। আর তাই তো রোজমেরী মাত্র নয় বছরের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছিল। অস্বাভাবিক মেমারি, অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, অন্যভাবে চিন্তার ক্ষমতা—সবই এই চিপের বদান্যতায়।'

'তা চিপটা ওর মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট করল কে? অন্য গ্রহের জীব তো আর

রিমোট নিয়ে বসে ওর মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট করবে না!'

'হ্যাঁ, এটাই ছিল সবথেকে শক্ত প্রশ্ন। আমরা প্রথমেই পেরুর লা রিন্‌কোনাডায় খোঁজ করি। সেখানে রোজমেরীর ছোটবেলা কেটেছে। জানার চেষ্টা করি অস্বাভাবিক কোনোকিছু ঘটেছিল কিনা গত দশ বছরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারি, পেরুর লিমায় ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ামে প্রায় আট বছর আগে একটা অদ্ভুত মেটাল বাক্স জমা পড়ে। ঐ ধরনের ধাতু আমাদের পৃথিবীতে নেই। আমাদের ধারণা চিপটা ছিল ঐ বাক্সেরই মধ্যে। কারণ বাক্সটা পাওয়া গিয়েছিল লা রিন্‌কোনাডায়, যেখানে রোজমেরীও ছিল। তাছাড়া রোজমেরীর হঠাৎ পরিবর্তন আর বাক্সটার উদ্ধার প্রায় একই সময়ে।'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

ডঃ রেনো বলে ওঠেন, 'এটা প্রমাণিত নয়। তবে খুব সম্ভবত এটাই হল ঘটনা। আমি যা বলছি তা সত্যিই আপনাদের অবাক করবে। প্রক্সি সেঞ্চুরির মধ্যে কোনো একটা গ্রহে আমাদের অনেক লক্ষ বছর আগে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ঠিক সেরকমই সভ্যতা যা নিয়ে আমরা আজ পৃথিবীতে গর্ব করি। হয়তো ওরা আরও অনেক এগিয়েছিল। কিন্তু, যেভাবে অনেক সভ্যতাই হয়তো অতীতে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেরকম ওদেরও বিপর্যয় এল। বাধ্য হয়ে ওরা গ্রহ-গ্রহান্তরে খোঁজ করতে শুরু করল কোথায় বাসস্থান পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ গ্রহে তো আর অভিযান করা যায় না, তাই ওরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করল সেই সব গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে। গ্রহে প্রাণ থাকার অর্থ হল, খানিকটা হলেও বাসযোগ্য অবস্থা। আর সেটাই ওদের চাই। ওরা ছোট ছোট রোবট পাঠিয়ে দিল দূর-দূরান্তের গ্রহে। সেইসব রোবটে লাগানো ছিল অত্যাধুনিক চিপ, যা কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শে এলে তার দেহে ট্রান্সফার হয়ে তার বুদ্ধিকে

নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর তার মাধ্যমেই ওদের গ্রহে যোগাযোগ করবে। সিগন্যাল পেলেই ওরা বুঝবে যে সেই গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, বাসযোগ্য পরিবেশ আছে। আর রোবট তাদের অনুসন্ধান চালাতে পারবে বহু লক্ষ বছর ধরে যা একজন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনি বলছেন ঐ বাক্সটা হচ্ছে আসলে রোবট? আর তা বহু বছর আগে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল?'

'ঠিক তাই। ঐ বাক্সটা খুব সম্ভবত রোবটটার একটা অংশ, যেখানে ঐ চিপটা ছিল। যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, তার আশপাশের পাথর দেখে বুঝেছি প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে ওরা এই রোবট পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে। তখন আদিমানব হোমোইরেকটাস বা হোমোস্যাপিয়েন্সরাও পৃথিবীর মাটিতে হাঁটেনি। তারপরে আবার এটা এসে পড়েছিল লা রিনকোনাডার মতো সতেরো হাজার ফুট উচ্চতার দুর্গম এলাকায়। সেখানে তখন বুদ্ধিমান প্রাণী কোথায়? হাজার হাজার বছর ধরে ঐ রোবট মাটির অনেক নীচে চলে যায়। মাটি খুঁড়তে খনি থেকে তা বেরিয়ে পড়ে। আর সেই পাথরই চলে আসে রোজমেরীর হাতে। রোজমেরীর দেহে রোবট থেকে ট্রান্সফার হয়ে আসে বুদ্ধিমান চিপ, যা রোজমেরীকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। রোজমেরীর মাধ্যমে সিগন্যাল যায়, ওদের গ্রহে প্রথম আজ থেকে প্রায় নয় বছর আগে।'

'তার মানে তো সাঙঘাতিক বিপদ! যে কোনো সময় ওরা পৃথিবীতে অভিযান করতে পারে।'

'সে ভয়টা আজ আর নেই। ইনফ্যাক্ট, রোজমেরীও একই কারণে আত্মহত্যা করে। ওদের গ্রহে আজ আর কোনো প্রাণ নেই। কী কারণে তা আমরা জানি না। ওদের ওখান থেকে একমাস আগে মেসেজ আসে। 'আমরা নেই।' রোজমেরী মেসেজটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। আর

তার পরদিনই আত্মহত্যা। আমরা ডি-কোড করতে পেরেছি দিন দশেক আগে। আর তখনই নিশ্চিন্ত হই।'

'তা ওরাই যখন নেই, তখন মেসেজ পাঠাল কে?'

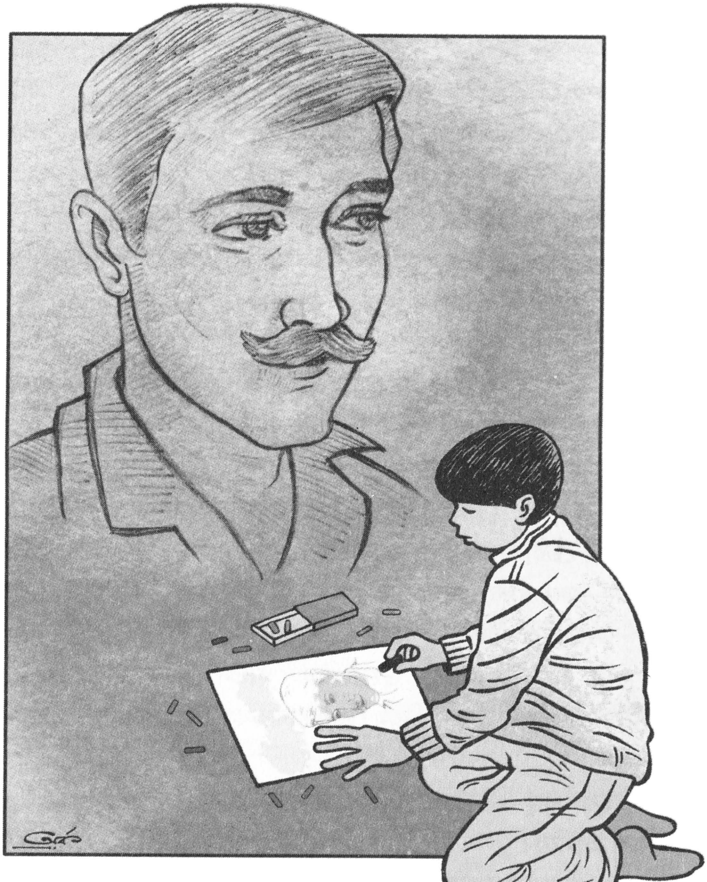
'হয়তো এরকমই কোনো রোবট, যারা আজও ঐ গ্রহে আছে। সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণও নেই। তবু আজও প্রাণহীন সভ্যতার একমাত্র প্রতিনিধি ঐ রোবটগুলো ওদের হয়ে জানিয়ে দেয়—আমরা ছিলাম, আজ আর নেই। আমাদের ভুলো না কিন্তু।'

নিয়ম যখন ভাঙে

কাচের জানলার বাইরে তাকাল দীপন। বাইরে নীল আকাশ। যেন ছবির পাতা থেকে উঠে আসছে। দূরে কম্পাউন্ডের দেওয়ালের উপর একটা চিল বসে আছে। কি যেন দেখে, ডানা দুটো স্থির রেখে কম্পাউন্ডের মধ্যে একপাক খেয়ে বাইরে চলে গেল। ইস্, দীপনও যদি এত সহজে এই 'আরোগ্য'-র বাইরে যেতে পারত।

ছোট থেকে ও এখানেই আছে। ও একা নয়—ওর বয়সী, ওর থেকে বড়ো আরো অনেকে। ওরা প্রত্যেকেই ক্লোন। ছোটবেলা থেকে ক্লোনদের সরল নীতি ও রোজ মুখস্থ করে এসেছে। প্রথম নীতি—ক্লোনদের জীবনের একটাই উদ্দেশ্য। তাঁর জিনদাতাকে রক্ষা করা—প্রয়োজন মতো নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় নীতি—ক্লোনদের তার নিজের জীবন রক্ষার অধিকার থাকবে ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ না প্রথম নীতির জন্য সে অধিকার ভাঙতে হয়। ক্লোনদের যাবতীয় খরচ তার জিনদাতাই বহন করে। পরিবর্তে, যখন দরকার হয় তখনই জিনদাতা ক্লোনদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারে।

ওদের এখানে তাই অন্য জগৎ। ওরা বাইরের কারুর সঙ্গে মেশে না। বাইরের কোন খবর রাখতে দেওয়া হয় না। সব কিছু নিয়মে বাঁধা। সময়



বেঁধে পড়া, স্বাস্থ্যচর্চা, খেলা, খাওয়া, ঘুমোনো। সুস্থ না থাকলে অঙ্গদান করবে কি করে! সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু দেড় বছর আগে এই 'আরোগ্য'-তে একজন লোক এসেছিল—সবার জন্য চকলেট, মিষ্টি এসব নিয়ে। কোন একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাজ করে। ওই লোকটা বেশ কয়েকটা গল্প বলেছিল। তারমধ্যে একটা ছিল বাবা ও ছেলের গল্প। ছেলের মৃত্যুর ভুল খবর পেয়ে সে লোকটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে শত্রুসেনার হাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। এটা শোনার পর দীপন শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'বাবা' কী হয়?

শম্ভু ওদের সবার দেখাশোনা করে। রোবট। ও বলেছিল—

—আমি কি জানি। আমি হলাম মুখ্যুসুখ্যু রোবট। আমাদের কি আর বাবা হয়? তবে বাবারা খুব ভালো হয়, একথা আমি শুনেছি।

—আমাদের বাবা হয় শম্ভুদা?

—হ্যাঁ, হয় বৈকি। তোমরা তো মানুষ। যার থেকে জিন নিয়ে তোমায় তৈরী করা হয়েছে—তুমি যার ক্লোন—সেই তো তোমার বাবা।

—বাবা এখানে কখনো আসে না কেন শম্ভুদা?

—সে কি আর আমি জানি? এটাই নিয়ম।

এর বেশি আর কোন উত্তর পায়নি দীপন। এটাই নাকি পৃথিবীর নিয়ম। এটাই আরোগ্যের নিয়ম। কিন্তু বাবার কথাটা আর ভুলতে পারেনি দীপন।

হঠাৎ শম্ভু এসে ঘরে ঢোকে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। তোমার বাবা আসবে।

—বাবা? এত অবাক দীপন আগে কখনও হয়নি। শম্ভুর কথায় বিশ্বাস হল না দীপনের—সত্যি, বলছ শম্ভুদা?

—হ্যাঁ, নয়তো কি? এই তো স্যার জানাতে বললেন বলেই এলাম।

খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন—বলে শম্ভু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর আরো অনেক কাজ আছে। এই আরোগ্য তে যে চৌত্রিশ জন বাসিন্দা আছে তাদের সবার দেখাশোনার ভার শম্ভু আর হরির ওপর। তাই একফোঁটা সময় নেই ওর।

দীপন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। আনন্দে কি করবে ঠিক করতে পারে না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্যাসেজ দিয়ে ছুটতে শুরু করে। হাতদুটো প্লেনের ডানার মতো ছড়িয়ে। প্রথমেই ছুটে এসে ঢোকে অনিমেষ জ্যেঠুর ঘরে। জ্যেঠু দীপনের সব থেকে বড় বন্ধু। সবরকম খবর তাই প্রথমে অনিমেষ জ্যেঠুকেই শোনায় দীপন।

—জ্যেঠু, জ্যেঠু—আমার বাবা আসবে। শম্ভুদা বলল।

যতটা খুশি হওয়ার কথা—অনিমেষ জ্যেঠু সেরকম কিছুই খুশি হল না।

—কী, ফোন করেছিল?

—তা জানি না—শম্ভুদা জানে। তবে আসছে শিওর।

—শম্ভু আর কিছু বলেছে? কেন আসবে?

দীপন মাথা নাড়ল। বাবা আসছে। এটাই বড় কথা। কেন আসছে তা নিয়ে দীপনের কোন মাথাব্যথা নেই।

অনিমেষ জ্যেঠু দীপনের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে আনমনে কি যেন ভাবতে লাগল। অনিমেষের বয়স পঞ্চান্ন। এই পঞ্চান্নটা বছর ও কাটিয়েছে 'আরোগ্য'র চার স্কোয়ার মাইল এলাকার মধ্যে। ওর একরঙা জীবনে ও বাবার দেখা পেয়েছে মাত্র দুবার। শেষবার বছর পনেরো আগে। কিডনী অপারেশনের সময়। ওর কিডনী ওর বাবার কাজে লেগেছিল। দিতে পেরে খুশিই হয়েছিল ও। এ জন্যেই তো ওর বেঁচে থাকা। তবু অনিমেষের মাঝে মধ্যে খটকা লাগে। ওর বাবার নাম

অরিজিৎ। দেখতে ঠিক ওরই মতো। হওয়ারই কথা। ওর জিনের গঠন তো হুবহু ওর বাবারই মতো। কিন্তু ঐ চেহারাতেই যা মিল। ওর বাবা একটা ব্যাঙ্কে খুব উঁচু পোস্টে কাজ করেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। আর অনিমেষ। অনিমেষের সারা জীবন কেটেছে এই 'আরোগ্য'-র চার স্কোয়ার মাইলের মধ্যে।

এই আরোগ্য-তে কোনো বই নেই, ইন্টারনেট নেই, কোনো কিছু জানার অধিকার নেই। কম্পাউন্ডের বাইরে যাওয়ারও অনুমতি নেই।

অনিমেষ অবশ্য এখন এই জীবনেই অভ্যস্ত। কিন্তু দীপনের কথাটা মনে হতেই মনটা কেমন যেন করে উঠল। ওর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে অনেকবার ও দেখেছে ওর কোনো বন্ধুরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর ফেরেনি। পরে শুনেছি দ্বিতীয় নীতির কথা। প্রাণ দিয়ে জিনদাতাকে বাঁচানোর মহৎ গল্প।

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। শম্ভুর কাছে খোঁজ নিতে। কেন দীপনের বাবা আসছে তা জানা দরকার।

দীপন ততক্ষণ ছুটেছে বিল্টু, চয়ন, অর্ণব-এর কাছে। প্রথমেই বিল্টুর সঙ্গে দেখা। বিল্টুর বয়সও দীপনের মতোই, ওরও আজ অব্দি বাবার সামনা সামনি হওয়ার সুযোগ হয়নি। দাঁত ব্রাশ করছিল। বিল্টুকে খানিকটা চমকে দিয়েই দীপন বলে উঠল—জানিস, শম্ভুদা বলল, বাবা আসবে।

খবরটা এতই অবাক করার মতো যে, কোন রকমে পেস্টটা গিলে ফেলে বিল্টু বলে উঠল—বলিস কিরে! দাঁড়া, রাতুলকে খবরটা দিই।

দুজনে মিলে রাতুলের ঘরে ছুটল। রাতুল ডেস্কে বসে খাচ্ছিল। কথাটা শুনে মুখ ভেংচে বলে উঠল—সে আবার বড় কথা কি? আমার বাবাও তো তিনমাস বাদে আমার জন্মদিনে আসবে বলেছে।—বলে আবার খাওয়ায় মন দিল। রাতুল একটু হিংসুটে প্রকৃতির।

ইতিমধ্যে দীপনের ফোনটা বেজে উঠেছে। শম্ভুদার ফোন।

—শোনো, ডাক্তারবাবু এসেছে। তোমার টেস্ট করবে।

এই ডাক্তারবাবু লোকটাকে দীপনের একেবারেই পছন্দ নয়। এলেই এই ভ্যাকসিন—ওই ভ্যাকসিন—সারাক্ষণ ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে ঘোরে।

—কেন শম্ভুদা? এই তো সেদিন ডাক্তারবাবু টেস্ট করে গেল।

—আহা, আমি কি আর অতশত জানি! আমি হলাম গে মুখ্যুসুখ্যু রোবট। তুমি হল ঘরে চলে এসো।

অগত্যা দীপন ধীরে সুস্থে হল ঘরের দিকে এগোল। ডাক্তারবাবু যথারীতি স্যুট-টাই পরে এসেছে। দীপনকে দেখা মাত্র বলে উঠলেন—ভয় পেওনা দীপনবাবু। টুক করে কয়েকটা টেস্ট সেরে নেব। টেরও পাবে না।

মিনিট পনেরো টেস্ট করে ডাক্তারবাবু দীপনের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন—পারফেক্ট। সব ঠিক আছে। অনিমেষ জ্যেঠু পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বলে উঠল—ডাক্তারবাবু, কি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হবে?

—হার্ট।

—সে কি? তাহলে দীপনের কি হবে?

—আপাতত শুয়োরের হার্ট বসিয়ে দেব। ভয় নেই এরকম কেস আকছার হচ্ছে। দীপন দুদিনেই আবার ছুটবে।

দীপনের অবশ্য এসবে কোন ভয় নেই। ওর একটাই চিন্তা—বাবা শেষমেষ আসবে তো? তা না হলে রাতুল যা পিছনে লাগবে।

ঘরে গিয়ে চট করে চান করে জামাকাপড় পরে নিল দীপন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিল। বাবাকে কি একইরকম দেখতে? নীল বলছিল বাবাদের গোঁফ হয়। একটা গোঁফ

এঁকে নিল দীপন। ইস মোটেও ভালো লাগছে না। অনেক লম্বা? আয়নার মতো? রাগী নয় তো! একটু যেন ভয় লাগল দীপনের। বই-জামা কাপড় সব গুছিয়ে রাখল। যদি ঘরে আসে। পরশু শেখা ইংরেজী কবিতাটা দু'বার আওড়ে নিল। বাবাকে শোনাতেই হবে। আর একটা গল্প বলতে পারলে আরো ভালো হত। অনিমেষ জ্যেঠু যে ভূতের গল্পটা বলেছিল সেটা অবশ্য খানিকটা মনে আছে।

দীপনের এই ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ শুভ এসে হাজির।

—অ্যাই, শুনলাম তোর বাবা আসছে?

—হ্যাঁ, এই এক্ষুণি এসে পড়বে।

—তা, বাবাকে কী দিবি?

—হার্ট। পট্ করে বলে ফেলল দীপন।

—আরে ও দেওয়া নয়—কোন্ গিফ্ট দিবি না?

তাই তো! একথাটা তো একদমই খেয়াল হয়নি। কিন্তু কি দেওয়া যায়?

জিজ্ঞেস করতে শুভ বেশ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল—চশমা।

আসলে শুভ ওর বাবাকে এক ছবিতে চশমা পরতে দেখেছে। তাই ওটাই আগে মনে এল।

কিন্তু দীপন চশমা এখন কোথায় পাবে? অনেক ভেবে ও ঠিক করল যে একটা ছবিই এঁকে দেবে। রং-পেনসিল নিয়ে আঁকতে বসে গেল ও। কতক্ষণ আঁকছিল কে জানে? হঠাৎ হুঁশ ফিরল। বাবার আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ছুটে চলল শম্ভুদার কাছে।

—শম্ভুদা, বাবা কখন আসবে?

—বলল তো ফোনে জানাবে। দাঁড়াও ফোন করে দেখি।

ফোন খানিকক্ষণ বেজে গেল। কেউ ধরল না।

—দাঁড়াও, পরে আবার ফোন করব। তুমি ঘরেই থেকো।

দীপন ঘরে ফিরে আসে। ঘড়ির সামনে বসে থাকে।

নটা-দশটা এগারোটা-বারোটা। ঘড়ির কাঁটা এগিয়েই চলেছে। দুপুরের খাওয়ার ডাক পড়ে।

—শম্ভুদা আমি এখন খাবো না। আমার খিদে পায়নি।

—আহা, রাগ করছ কেন? দাঁড়াও, আমি আবার ওনাকে ফোন করি। এবার শম্ভুর ফোনে উল্টোদিক থেকে সাড়া মেলে।

—হ্যালো, আমি অনিরুদ্ধ বলছি।

—হ্যালো স্যার, আমি আরোগ্য-র কেয়ারটেকার শম্ভু বলছি। আপনি কখন আসবেন? দীপন অপেক্ষা করছে সকাল থেকে।

—নাহ্, আসার দরকার হবে না। এইমাত্র ডাক্তার বলে গেল এখন আর তেমন রিস্ক নেই। পরে দরকার হলে যোগাযোগ করব।

—হ্যালো, হ্যালো স্যার। দীপনকে কি বলব? ও যে সকাল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছে। বাচ্চা ছেলে তো—আপনার জন্য ছবি এঁকেছে। আপনি না এলে খাবে না বলছে।

—আমার জন্য!—আকাশ থেকে পড়ে অনিরুদ্ধ। একটু থেমে বলে ওঠে। —শম্ভু, তুমি তো নিয়মকানুন জানোই। আমার দেখা করাটা ঠিক হবে না। ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেলে ভারী মুস্কিল। বলে দিও-বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নাহ্, তা না বলো অফিসের কাজে আটকে পড়েছে। পরে একদিন আসবে।

ফোন কেটে যায়।

দীপনের দিকে তাকিয়ে শম্ভু বলে ওঠে-ভারি মুস্কিল হল তো। উনি আসছিলেন, হঠাৎ ভারী দরকারী কাজ পড়ে গেছে। পরে একদিন আসবেন।

শম্ভুর কথায় বাধা আসে। আবার ফোন বাজছে। অনিরুদ্ধবাবুর ফোন।

—শম্ভু, ছেলেটার নাম কি যেন?

—দীপন।

—ওর কবে যেন জন্মদিন?

—১৬ই অক্টোবর।

—ওকে বলো ওর জন্মদিনে আমি আসব। একটু থেমে আবার বলে—ফোনটা ছেলেটাকে দাও তো। কাছে আছে কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি।

শম্ভু ফোনটা দীপনকে বাড়িয়ে দেয়। ওদিক থেকে কি কথা বলছে শোনা না গেলেও দীপনের মুখ-চোখের চেহারা দেখে মুচকি হাসে শম্ভু। ওকে এত খুশী আগে কোনদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। দীপন একটা কবিতা বলছে ফোনে। ফোনে কথা চলতেই থাকে—অনেকক্ষণ ধরে।

শম্ভু মুচকি হেসে মাথা নাড়ে। এটা 2065 সাল। এখনও নিয়ম ভাঙে। এভাবেই। শম্ভুর মাথায় এসব ঢোকে না। ও হল গিয়ে মুখ্যসুখ্যু রোবট। তবু নিয়ম ভাঙলে খুব ভালো লাগে ওর।



অচেনা

নিয়ম যখন ভাঙে

আমাদের এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটা বেশ ভালো। বেশিরভাগ ছাপোষা চাকরিজীবী বাঙালি। অবসর সময় বেশিরভাগেরই কাটে আড্ডায়। তাতে কখনও ক্রিকেট, কখনও রাজনীতি, তো কখনও বাজারের পটল-বেগুন-পাবদা মাছের দাম। কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা বটগাছ আছে। তাকে ঘিরে একটা গোল চাতাল। তাতেই আমরা সন্ধের সময়ে মাঝে মধ্যে জমায়েত হই, তা ইদানীং আমাদের আলোচনায় একজনের নাম বারবার ঘুরে ফিরে আসে। সুদীপ চ্যাটার্জি।

মাসখানেক হল আমাদের এখানে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এসেছেন। একা থাকেন, কী করেন কিছুই বোঝার উপায় নেই। কোনও কাজের লোক নেই, বাড়িতে কোনও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরও যাতায়াত নেই। মাঝেমধ্যে সপ্তাহ খানেকের জন্য কোথায় উধাও হয়ে যান আবার কখনও কখনও হাতে একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন।

অনিন্দ্যই আজ প্রথম বলে উঠল,—ভদ্রলোক বোধহয় আইটি-তে আছেন, এত চুপচাপ, কম কথা বলেন। ভুঁড়ি আছে, চশমাও আছে, আইটি না হয়ে যায় না।

—যাহ্, আইটি হলে একটা ল্যাপটপ থাকত না সঙ্গে? আর আইটির লোকেরা ওরকম চাপদাড়িও রাখে না। ভদ্রলোক নির্ঘাত সায়েন্টিস্ট হবেন। কীরকম আনমনা চাউনি। সেদিন দেখলাম ভট্চাজদের কুকুরটার

দিকে মিনিট তিনেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে নিজের মনে কী একটা খুব শক্ত কথা বলে চলে গেলেন।—কৌশিক বলে।

ব্যাস—যথারীতি কৌশিক আর অনিন্দ্যর মধ্যে একটা তর্কাতর্কি বেধে গেল।

আসলে, বাঙালিদের এই কৌতূহল চিরকালের। যারা মিশুকে নয়, কথা বিশেষ বলে না—তাদের নিয়ে কৌতূহল আরও বেশি হয়। সুদীপবাবু ভালো-খারাপ যেমনটাই হোন—একটু যে অন্যরকম তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। যাই জিগ্যেস করা হয়, শুধু মিটিমিটি হাসেন। কুলগাছ দেখে হাঁ করে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। সেদিন মুখার্জির লাল স্যান্ট্রো গাড়িটার সামনে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। ধাক্কা লাগতেই পারত। কিন্তু সুদীপবাবু এতটুকু রাগেননি, উলটে অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নেড়ে নাকি বলেছিলেন,—নাহ্, হিসেব মিলল না। চার ন্যানো সেকেন্ডের জন্য মিস করে গেলাম।

আমার সামনেই সেদিন দেখলাম মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, তপসেটা পচা হওয়ার প্রোব্যাবিলিটি কত?

দেখি মাছওয়ালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

সেদিন থলে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। জেনেও শুধু আলাপ করার জন্যই প্রশ্ন করি,—বাজারে যাচ্ছেন?

আবার সেই এক হাসি। কোনও কথা নেই। আলাপ করার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

বাজারে ফের দেখা। তখন ভারী ব্যাগ। লাউ, সজনে ডাঁটা উঁকি মারছে। আবার আলাপ জমাই,—বাজার হল?

উত্তরে সেই হাসি।

—কীরকম লাগছে এ জায়গাটা?

আবার হাসি, মুখে কোনও কথা নেই।

এরকম বেশ কয়েক সপ্তাহ আমাদের মধ্যে ওনার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হওয়ার পরে কৌশিকের পক্ষেই সিদ্ধান্ত গেল। সুদীপবাবু সায়েন্টিস্ট শুধু নন—বড় সায়েন্টিস্ট। নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ গোপন রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

কয়েকদিন আগে ওনার ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে, কেউ বলে লাল, কেউ বলে নীল। মানস মাঝ রাতে ওনার ঘর থেকে অদ্ভুত একটা জন্তুর আওয়াজ শুনেছে। বলেছে নাকি কুকুরের ঘৌ-ঘৌ আর বেড়ালের ম্যাও-ম্যাও-এর মাঝামাঝি একটা আওয়াজ।

মানস নানা ধরনের আওয়াজ করে করে শোনাল। কিন্তু নিজেই স্বীকার করে নিল যে আসল আওয়াজটার কাছাকাছি হয়নি কোনটাই।

সেদিন ভটচাযদা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। কোনওরকমে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠলেন,—এই দ্যাখো, সুদীপের ফ্ল্যাটের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ এই কাগজটা সামনে এসে পড়ল। বলে একটা দাগকাটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজ আমাদের সামনে খুলে ধরলেন।

আমরা সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তাতে শুধু নানা ধরনের সিম্বল, আর মাঝেমধ্যে দু-একটা সংখ্যা। আমাদের মধ্যে শমিত অঙ্কের টিচার। বেশ খানিকক্ষণ দেখে ও মাথা চুলকে বলে উঠল,—হুঃ, মনে হচ্ছে খুব উঁচু দরের কোনও ইকোয়েশন। অর্ধেকটা বোঝা যাচ্ছে। ঠিকই ধরেছেন। সায়েন্টিস্টই হবে।

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের ছোট একটা অনুষ্ঠান ছিল। সাহাদাই বরাবর বক্তৃতা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। ওনার বেশ বয়েস হয়েছে। একসময় একটা নামকরা ক্লাবে ফুটবল খেলতেন। ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার ছিলেন। এবার ওনাকে বলতেই উনি হাঁই-হাঁই করে উঠলেন।

বললেন,—এত বড় একজন সায়েন্টিস্ট এখানে থাকতে আমি করব ফ্ল্যাগ হয়েস্টিং! ছিঃ ছিঃ! ওনাকে বল!

ঠিক কথা। এ উপলক্ষ্যে ওনার ফ্ল্যাটেও যাওয়া যাবে। তা যেই ভাবা সেই কাজ। আমরা কয়েকজন মিলে সন্ধেবেলা ওনার ফ্ল্যাটে হানা দিলাম। কলিংবেল বাজানোর মিনিট তিনেক বাদে দরজা খুললেন। হাতে একটা বড় ইঞ্জেকশান দেওয়ার সিরিঞ্জ। তাতে নীলচে রঙের লিকুইড। ভেবেছিলাম চিনতে পারবেন। কিন্তু পারলেন না। আনমনা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—না না, আইআইটি-র কনভোকেশনে আমি যেতে পারব না। আপনারা বরং রাজ্যপালকেই ধরুন।

কোনওরকমে থামিয়ে আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে আসার কারণ জানালাম।

সম্বিৎ ফিরে সব শোনার পর মিষ্টি হেসে বলে উঠলেন,—ইশ্, খানিক আগে বললে যেতে পারতাম। একটু আগেই স্টাইগন্যারকে কথা দিলাম। একটা কনফারেন্সে যেতে হবে।

পাশ থেকে রজত বলল,—তা, কনফারেন্সের পরই এসে যদি উদ্বোধনটা করে দেন।

উনি মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন,—সে কি হয়। ওটাতো জার্মানির বার্লিনে।

কুশল উৎসাহী হয়ে পিছন থেকে বলল,—তাহলে আপনি ফিরে এলেই না হয় ফ্ল্যাগ হয়েস্টিংটা হবে।

আমরা কুশলকে বোঝালাম যে সেটা সম্ভব নয়। ওটা ১৫ আগস্টেই করতে হবে। সুতরাং ওনার ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয়।

চলে আসার সময় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমিই সাহস করে জিগ্যেস

করলাম,—আচ্ছা, আপনার রিসার্চের টপিকটা কী?

সুদীপবাবু ফের মিটিমিটি হাসলেন। আঙুলটা আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন,—প্রকৃতির জটিল সমীকরণগুলো সল্‌ভ করা। তারপর আবার বললেন,—আমি অত্যন্ত সাধারণ এক মানুষ। একি আর আমার দ্বারা হবে! তবু চেষ্টা—গত কুড়ি বছর ধরে। বলে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বলতেই হবে সেই আনমনা চোখে আমরা হারিয়ে গেলাম। তারাভরা আকাশটা যেন স্পষ্ট ওনার চোখের ভেতরে চকচক করে উঠল। ওনার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাটা দশগুণ বেড়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে আমরা সবাই মিলে আড্ডা মারছি। হঠাৎ দেখি সুদীপবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। একটু যেন চিন্তার ছাপ মুখে।

গলা খাঁকরে নীচু স্বরে বলে উঠলেন, —কথাটা যেন জানাজানি না হয়। এই ধরনের কাগজ কেউ কি পেয়েছেন? রোজ সকালবেলা দেখি কে যেন আমার দরজার তলা দিয়ে একটা করে কাগজ রেখে যায়। —বলে গোটা দশেক সবুজ রঙের পাতা আমাদের হাতে তুলে দিলেন ভদ্রলোক।

কাগজের একটা দিকে 'মেডিকা' বলে একটা মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানির নাম-ঠিকানা-ফোন নাম্বার লেখা। অন্যদিকে ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা সংখ্যা। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সংখ্যা। ভালো করে লক্ষ করতে দেখা গেল '১৩' সংখ্যাটা প্রত্যেকটা কাগজেই আছে।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কেউই এরকম কাগজ পাইনি। বেশ খানিকক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা নেই। তারপর আমিই জিগ্যেস করলাম,—আপনি কাগজের উলটোদিকের ওই কোম্পানিটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলেন কি?

উনি মাথা নাড়লেন,—নাহ্‌, আমার কি আর অত সময় আছে? ওটা তো একটা নামকরা হেলথ ইনসিওরেন্স কোম্পানি। আসল রহস্যটা তো আছে উলটোদিকের পাতায়।

—কি মনে হয়, কিছু বুঝলেন?

—হ্যাঁ, ডিকোড করে দেখলাম—আর কিছু নয়। আমার প্রাণনাশের হুমকি। হয় আমার রিসার্চ বন্ধ করতে হবে নয়তো—

আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম,—সেকি। তা আপনি পুলিশে জানিয়েছেন?

—নাহ্‌, এসব সামান্য কারণে কি আর এ সমস্ত কথা পুলিশকে বলা যায়? প্রাণ আগে, না দেশ আগে! যাক সে কথা। বলতে বলতে আবার ফিরে চললেন।

আমরা সবাই ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সন্দীপের মতো শান্ত ছেলে—সে-ও হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—যে করেই হোক দাদাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। দেশের জন্য উনি প্রাণ দেবেন আর আমরা একই কমপ্লেক্সে থেকেও চুপ করে তা মেনে নেব।

বলতে নেই, সেদিন থেকে আমরা ছোট বড় সবাই সুদীপদাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলাম। ফ্ল্যাটের কাছাকাছি কেউ ঘোরাঘুরি করলে তাকে কড়াকড়া প্রশ্ন করতে ছাড়তাম না। যতই হোক, একজন নামকরা সায়েন্টিস্ট-এর নিরাপত্তা। উনি যা করেন আমরা সবাই তাই করতে চেষ্টা করি। উনি একদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরলেন তো পরেরদিন দেখা গেল আমাদের বেশ কয়েকজনের গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি।

তা, সবাই তো আর একরকম নয়, কারও-কারও মধ্যে হিংসেটা একটু বেশি থাকে, নির্বেদ সরকার এরকমই একজন। একসময়ে আইএসআই-তে নামকরা অঙ্কের প্রফেসার ছিলেন। ভারি দেমাক। কেউ বাড়িতে

যেতে চাইলেই বলতেন— 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসো।'

কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে তা জিগ্যেস করলে দু-সপ্তাহ পরের একটা দিন বলে দিতেন।

তা এরকম লোককে যে কেউ সহ্য করতে পারবে না, তাতে আর আশ্চর্য কি! আবার সুদীপদার মতো লোক আসার পরে কেউ আর ওনাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভারি খেপে গিয়ে দুর্গাপুজোর নবমীর দিনে উনি একদিন আমাদের সামনেই সুদীপদাকে চেপে ধরলেন।

—আপনি কি নিয়ে রিসার্চ করেন, বলুন তো? কোথায় চাকরি করেন?

কোনও উত্তর না দিয়ে সুদীপদা শুধু মিটিমিটি হাসলেন।

তাতে দারুণ খেপে গিয়ে নির্বেদবাবু বলে উঠলেন,—শুধু বুজরুকি তাই না! উলটোপালটা সিম্বল আঁকা কাগজ লোকের মাথায় ছুঁড়ে জ্ঞান জাহির করা হচ্ছে? অনেক হাত পালটে কাগজটা আমার কাছেও এসেছে। ওর না আছে কোনও মাথা—না মুণ্ডু।

আমরা নির্বেদবাবুকে প্রায় মারতেই যাচ্ছিলাম। সুদীপদা মুচকি হেসে হাত তুলে আমাদের থামতে বললেন। তারপর বললেন,—$-x^2/x$ হলে কি ধরে নিতে হয়?

—কী আবার। x যে জিরো নয় তাই ভেবে নিতে হয়।

সুদীপদা ফের হাসি হাসি মুখে বললেন,—আর যদি 'x' জিরো হয়? আমরা যা ভেবে নিই, ওরা তা ভাবে না। ইনকারাও ভাবত না। তাই আমাদের কাছে কোন সিম্বলের অর্থ যা ওদের কাছে তা অন্যরকম। এই বলে আঙুলটাকে ওপরের দিকে তুলে বলে উঠলেন,—'অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিও একই নিয়মে চলে।'

গত তিন বছরে নির্বেদবাবুকে আমরা কখনও এতটা চুপসে যেতে

দেখিনি। ওনার মতো দুর্মুখ লোককে প্রায় চুপ করিয়ে দিয়ে যেতে যেতে সুদীপদা অস্ফুটে বলে উঠলেন,—নাহ্, অঙ্কটা মিলছে না। এখনও অনেক কাজ বাকি।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। শুনলাম নির্বেদবাবু কোমরের চোটের জন্য হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। কমপ্লেক্সের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে দেখা করতে গেলাম। দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে ভদ্রলোক ছটফট করছেন। ওরকম তাগড়াই চেহারা। দেখে খারাপই লাগল। নির্বেদবাবু আমাদের দেখে কোনওরকমে বলে উঠলেন,—ওই লোকটি একদম সুবিধের নয়, চ্যালেঞ্জ করেছি বলে কীরকম প্রতিশোধ নিল দেখলেন?

—-কে? কোন লোকটার কথা বলছেন?

—আরে, ওই তোমাদের বিজ্ঞানী সুদীপবাবুর কথা বলছি আর কি! ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা।

—সে কী? আপনাকে মেরেছেন না কি?

—না, তা নয়। দুদিন আগে দেখি মুন্না সিং বলে একটা লোক এসেছে আমার ফ্ল্যাটে—বডি ম্যাসাজ করতে, বলে কিনা বিনা পয়সায় ট্রায়াল ম্যাস্যাজ, ভালো লাগলে মাঝেমধ্যে আসবে। রাজি হয়ে গেলাম। বিনা পয়সার ব্যাপার যখন। তা জীবনে ওসব করিনি। কি কুক্ষণে যে করাতে গেলাম। নির্বেদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—তো? তারপর? লোকটা গুণ্ডা ছিল না কি?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। খানিকবাদে আমাকে উপুড় করে ফেলে পিঠের ওপর সে কি লাফালাফি! কখনও ঘাড় ধরে টানে তো কখনও পায়ের আঙুল প্রায় ভেঙে দেয়। কখনও কোমর ধরে এমন টান মারে যে মনে হয় যেন রামধনুকে টান দিচ্ছে। আবার চুল নিয়ে কখনও চুলোচুলি করে তো কখনও মাথার তালুতে দমাদ্দম ঘুষি—ওহ্।

—তা আপনি কিছু বললেন না! অন্তত আমাদের তো ডাকতে পারতেন। অভিমানী সুরে কৌশিক বলে।

—আরে এরকম অবস্থা যে হবে, তা কি তখন বুঝেছি? প্রথমবার। ভেবেছি ম্যাসাজ বুঝি এরকমই হয়, তাই চুপচাপ মার খেলাম দেড়ঘণ্টা। তা শেষ হওয়ার পর সেই হতভাগা বলে কি জানো?

—কী? আমরা সমবেতভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম।

—বলে যে আমার এরকম লোহার শরীর বলেই নাকি এ ম্যাসাজ সহ্য করতে পারলাম। এ নাকি কোনও সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আমাকে অসাধারণ মনে হল কীভাবে?' তার উত্তরে লোকটা বলল যে, তোমাদের সুদীপ্ত নাকি ওকে বলেছে আমি কুংফুতে ভারত-চ্যাম্পিয়ান। আমাকে ভুলেও যেন আস্তে আস্তে ম্যাসাজ না করে। তাতে নাকি আমাকে অপমান করা হবে। বোঝো!

আরও খানিকক্ষণ কথা বলে সেদিন হাসপাতাল থেকে চলে এসেছিলাম। খারাপ লেগেছিল, তবে বিশ্বাস করিনি। কিছুদিন বাদে সুদীপদার দেখা পেয়ে নির্বেদবাবুর ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম। তা উনি দেখি মুখে চুক্‌চুক্ করে আওয়াজ করে মাথা নেড়ে বললেন,—কি যে ভুলো মন আমার। ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

বলে একটু থেমে আবার বললেন,—তা ভদ্রলোকের মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স আছে কি? চিকিৎসার খরচ আজকাল এত বেড়ে গেছে। এইজন্যই সবার মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স রাখা উচিত বুঝলেন? এই তো ক'দিন আগে আমার এক আত্মীয়—হঠাৎ তার লিভারের সমস্যা। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। অথচ কোনও ইনসিওরেন্স নেই।

এটাই সুদীপদার সঙ্গে শেষ দেখা। কয়েকদিন বাদে শুনলাম সুদীপদা নাকি কমপ্লেক্স ছেড়ে চলে গেছেন। শুনে তো মন খুব খারাপ।

কমপ্লেক্সের গ্ল্যামার এক ধাক্কায় অর্ধেক। যার ফ্ল্যাটে ভাড়া ছিলেন তাকে ধরলাম। যদি সুদীপদার কোনও ঠিকানা থেকে থাকে! ঠিকানা পাওয়া গেল না। ছোট নোটে যাওয়ার আগে শুধু লিখে গেছেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য সুমেরুর বিলুপ্তপ্রায় সাদা ভালুকদের পাশে দাঁড়াতে কিছুদিনের জন্য ওনাকে নাকি ওদিকে যেতে হচ্ছে।

সুদীপদার আর খোঁজ পাইনি। সায়েন্টিস্টরা বুঝি এরকমই হন। নিজেদের প্রচারের আলো থেকে দূরে রেখে শুধু কাজই করে যান। আর আমাদের মতো নিন্দুকেরা! আমরা শুধু সন্দেহ করি, পরনিন্দা, পরচর্চা করি। ঠিক যেমন নির্বেদবাবু। দু-মাস বাদে আধখানা চেহারা নিয়ে কমপ্লেক্সে ফিরে এসে বললেন,—বিজ্ঞানী না হাতি! মেডিক্যাল ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। কীরকম কায়দা করে সবার হাতে 'মেডিকা' ইনসিওরেন্সের সব ডিটেলস রেখে গিয়েছিল। ওই সবুজ কাগজটা মনে পড়ে? আমরা সবাই অন্যদিকের হাবিজাবি অঙ্কই দেখছিলাম। কিন্তু তখন খেয়ালই হয়নি যে ব্যাটা একটা ইনসিওরেন্স এজেন্ট। কায়দা করে অ্যাডভার্টাইজ করছে।

বলতে থাকেন—দেখো কি সুন্দর প্লট। শুরু থেকেই চেষ্টা চালিয়ে গেছে যাতে ওর প্রতি আমাদের কৌতূহল তৈরি হয়। তোমরা বেশিরভাগই ওকে ফলো করতেও শুরু করেছিলে। অবশ্য আমি না। তারপর নিজের সেই ভালো ইমেজটা কাজে লাগিয়ে ও সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে ইনসিওরেন্সের ডিটেল্স।

আমরা সবাই নির্বাক হয়ে শুনছিলাম। নির্বেদবাবু বলে চললেন,—প্রথমে বুঝতে পারিনি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে 'মেডিকা' ইনসিওরেন্সের কাগজটার লোকাল নাম্বারে ফোন করে কথা বলার পর, হঠাৎ মনে হল গলাটা আর কথা বলার ধরনটা এত চেনা লাগছে কেন!

পরে খেয়াল হল। লোকটার সঙ্গে দেখা হোক, দেখাচ্ছি মজা।

আমরা কিছু বললাম না। নিন্দুকেরা তো অনেক কিছুই বলে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমরা প্রত্যেকেই সুদীপদার শেষ উপদেশটাও শুনেছি। চোখের সামনে নির্বেদবাবুর অবস্থা দেখে দল বেঁধে 'মেডিকা' ইনসিওরেন্সটা করিয়েছি। এই কয়েকদিন হল।

ডারউইনের ডায়েরি থেকে

বিশ্বজিৎদা সেদিন হঠাৎ ঝড় তুলল। ফুটবল-ক্রিকেট নয়, রাজনীতি নয়, খাওয়ার কথাও নয়। একেবারে চালর্স ডারউইন। কথা হচ্ছিল সাগ্নিকের জাহাজে করে আন্দামানে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে। সেখান থেকে একেবারে চালর্স ডারইউনের বিগ্‌লে করে সমুদ্রযাত্রায়।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন। এটাই বিশ্বজিৎদার স্বভাব। কিছু একটা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলেই হল। কোনও-না-কোনওভাবে বিষয়টাকে তুলবেই।

বিশ্বজিৎদা বলতে শুরু করে,—ডারউইনের কেরিয়ারটা আমারই মতন। ছাত্রজীবন একেবারে সাদামাটা। বাবা-ই জোর করে কেমব্রিজে জিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন। কেমব্রিজ থেকে বাড়ি ফেরার পর উনি একটা চিঠি পান। ক্যাপ্টেন ফিৎজ্‌রয়ের কাছ থেকে। উনি বিশ্বভ্রমণে বেরোচ্ছেন। একজন প্রকৃতিবিদকে জায়গা দিতে পারেন। তবে সে-বাবদ উনি কোনওরকম টাকা দেবেন না। ডারউইনের হার্টের প্রবলেম ছিল। বাবারও আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও ডারউইন ওই দীর্ঘসফরে বেরিয়ে যান...বল তো যাত্রা শুরুর সালটা কত ছিল?

আমাদের নিরুত্তর দেখে বিশ্বজিৎদা দ্বিগুণ উৎসাহেই বলে ওঠে,—

তোরা পড়ার বইয়ের বাইরে কোনও কিছুই তো জানলি না। শুনে রাখ, সালটা ছিল ১৮৩১।

আর দিনটা ছিল ২৭ ডিসেম্বর।—খোলা দরজার সামনের চাতালে জুতো খুলতে-খুলতে অনিলিখা বলে ওঠে। অনিলিখাকে দেখেই বিশ্বজিৎদার সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। উবে যাওয়ারই কথা। অনিলিখার সামনে আর জ্ঞান জাহির করা চলে না। এমন কোনও বিষয় নেই যা অনিলিখার অজানা। অতীতেও আমরা এমন অনেক প্রমাণ পেয়েছি। অনিলিখার কথাই আমাদের কাছে বেদবাক্য। এমনকি বিশ্বজিৎদাও অনিলিখাকে আজকাল বেশ খাতির করে চলে।

তা অনিলিখা ফের বলে ওঠে,—ইংল্যান্ডের ড্যাভেনপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু হয়। দু-দুবার যাত্রা শুরু করেও বাজে আবহাওয়া ঝড় ইত্যাদির জন্য ফিরে আসতে হয়। কে তখন জানত, যে এই যাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে সবথেকে আলোচিত যাত্রা হতে চলেছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল চিলি, পেরু ও প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটা দ্বীপের তটভূমি সার্ভে করা। ১৮৩২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ওরা ব্রাজিলের বাহিয়া পৌঁছয়। ৩ এপ্রিল, ১৮৩২ রিও-ডি-জেনেরোতে। ২০ অক্টোবর, ১৮৩৫ সালে বিগ্‌ল গ্যালাপাগোস দ্বীপ থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করে। তাহিতি, নিউজল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, কেপ অফ গুডহোপ, সেন্ট হেলেনা, অ্যাসিকন দ্বীপ ছুঁয়ে ফলমাউথ পৌঁছয় ১৮৩৬ সালের ২ অক্টোবর। ওখানেই ডারউইন জাহাজ ছাড়েন।

১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ প্রায় পাঁচ বছর ডারউইনের কেটেছিল ওই জাহাজে। ডারউইনের ছিল ডায়েরি লেখার নেশা। রীতিমতো সাহিত্যিকের চোখে সবকিছু দেখতেন। ওঁরা কবে কোথায় গিয়েছিলেন, কী করেছিলেন তার যাবতীয় বিবরণ পাওয়া যায় ডারউইনের ডায়েরিতে।

ডারউইনের ডায়েরি থেকে

ডারউইনের এই ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ হয়েছে। অনেকে পড়েছে। আমিও পড়েছি। কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখে বেশ অদ্ভুত লেগেছে। যিনি প্রায় প্রতিদিন ডায়েরি লিখে গেছেন, তিনি হঠাৎ করে মাঝের পনেরো দিন লেখা ছেড়ে দিলেন কেন? আবার লেখা শুরু করলেন এমনভাবে যে তাতে কোনও বৈজ্ঞানিক বা অন্য তথ্যের ব্যাপার নেই, খালি দার্শনিকতা! ডায়েরির শেষের দিকের ডারউইন যেন আগের থেকে একেবারে আলাদা। এমন কী ঘটেছিল ওই পনেরো দিনে?

প্রশ্নটা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই অনিলিখা উঠে দাঁড়িয়েছে। যেতে-যেতে বলে ওঠে,—পরের শনিবার পুরো ব্যাপারটা বলা যাবে। আজ বিশাল কাজের লিস্ট নিয়ে বেরিয়েছি। পাঁচ মিনিট ঢুঁ মেরে গেলাম।

অনিলিখার কাছ থেকে জোর করে গল্প আদায় করা শিবেরও অসাধ্য। অতএব অন্তত এক সপ্তাহের অপেক্ষা।

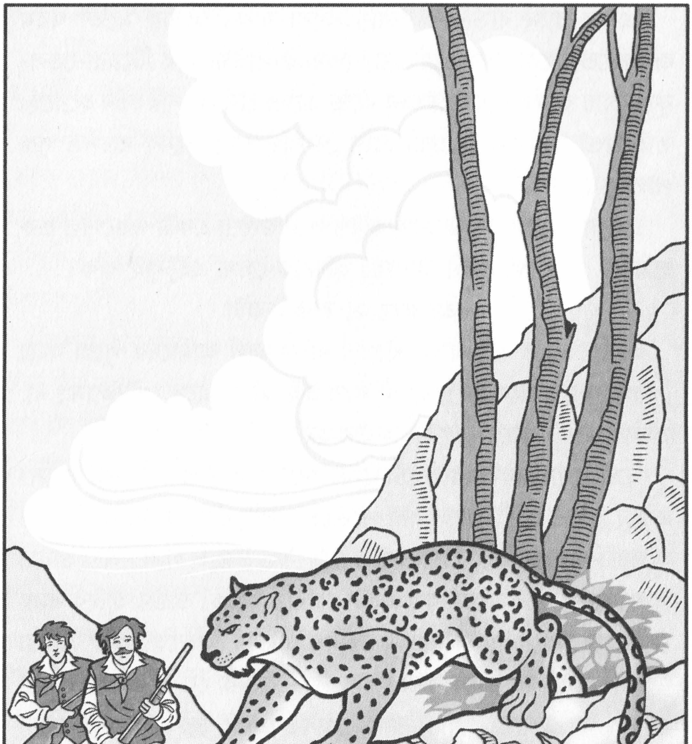
পরের শনিবার ঠিক দুটোর সময় অনিলিখা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। আমরা সবাই অনেক আগেই জড়ো হয়েছি। অনিলিখার হাতে বেশ কয়েকটা কাগজ। চেয়ারটা টেনে নিয়ে ও সোজাসুজি বলতে শুরু করে,—মাঝের পনেরো দিন লেখা হয়নি কথাটা ঠিক নয়। লেখা হয়েছিল। যাতে সবাই এই পনেরো দিনের কথা জানতে না-পারে, তাই ডারউইন অংশটা বাদ দিয়েছিলেন। আমি কী করে ওই পনেরো দিনের ডায়েরির খোঁজ পেলাম সে-সবের মধ্যে যাচ্ছি না। অরিজিনাল লেখাটা পড়ার ঠিক একঘণ্টা সময় পেয়েছিলাম। পরে সেটা অনুবাদ করে সংক্ষেপে লিখে রাখি। আজ সেটাই পড়ে শোনাচ্ছি।

অক্টোবর ১, সকাল দশটা

খানিক আগে আমরা টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো ছেড়েছি। টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্ত। ৫৩° দক্ষিণ অক্ষাংশে

কিরকম ঠাণ্ডা হয় তা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না। জাহাজের মধ্যে একজায়গায় আগুন জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে বসেছিলাম। জাহাজটা খুবই ছোট। জায়গার বড়ই অভাব। তবু তারমধ্যেই প্রায় তিন বছর কেটে গেল। এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো ভারি অদ্ভুত জায়গা। তটভূমির প্রায় গা দিয়েই সারমিয়েন্টো পাহাড়। উচ্চতা বেশি নয়। সাত হাজার ফুট। কিন্তু পুরো বরফে ঢাকা। মাঝে-মাঝেই ভীষণ শব্দ করে বরফের চাঁই জলে এসে পড়ছে। অজস্র হিমবাহ জলে ইতস্তত ভাসছে। এর আঘাতে কত জাহাজের যে সলিলসমাধি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাপ্টেন ফিৎজ তাই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে আস্তে-আস্তে জাহাজ চালাচ্ছেন। হিমবাহগুলো ভয়ংকর হলে কী হবে। নীলচে হিমবাহর উপর সূর্যের আলো পড়ে যে অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে, তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা কঠিন। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে চোখের খুব ক্ষতি হয়, অথচ চোখ সরাতেও ইচ্ছে হয় না। আপাতত আমরা উত্তরের দিকে চলেছি। ভাল্ পারেসোর দিকে।

যেতে-যেতে পুমার কথা মনে হচ্ছে। পুমা আসলে এক ধরনের সিংহ। মূলত দক্ষিণ আমেরিকাতেই পুমা দেখা যায়। অবশ্য পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই এর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এদের আচার-ব্যবহার আলাদা। খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এদের চেহারাতেও। নিরক্ষরেখার উষ্ণ বনাঞ্চলেও যেমন এদের পাওয়া যায়, তেমনই আবার এদের দেখতে পাওয়া যায় টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগোর মতো ঠাণ্ডা জায়গাতেও। সমতলেও যেমন দেখেছি, তেমনি এদের পায়ের ছাপ দেখেছি দশ হাজার ফুট উঁচুতে। ল্যা-প্লাডায় পুমার শিকার হয় হরিণ, অস্ট্রিচের মতো প্রাণীরা। মানুষের উপরে এরা কখনও আক্রমণ করে না। কিন্তু চিলিতে যেহেতু হরিণ অত সহজলভ্য নয়, তাই মানুষের উপর



আক্রমণের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়।

এবার হামিংবার্ড-এর কথায় আসা যাক। লিমার মতো গরম জায়গাতেও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগোর বনে। তবে প্রয়োজন মতো এদের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে। তাই ঠাণ্ডা জায়গায় যে হ্যামিংবার্ড দেখেছি তারা অনেক বড়সড় পুরু পালকে মোড়া।

লেখায় বাধা আসছে। খানিকক্ষণ পরে উপরে একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। দেখে আসি কী ব্যাপার। আজকে লেখা এইটুকুই থাক।

অক্টোবর ২, রাত একটা

ভারি অদ্ভুত এই দ্বীপ, দ্বীপটা না দেখলে আমাদের পুরো যাত্রা বিফলই হতো মনে হয়। তা-কী করে এই দ্বীপে এসে পৌঁছলাম? না, তাহলে একটু আগে থেকেই বলতে হয়।

সেদিন ডেকে চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে দেখে উপরে উঠে আসি। একটা অদ্ভুত প্রাণী জালে ধরা পড়েছে। দেখতে অনেকটা ডলফিনের মতো। কিন্তু ডলফিনের মতো দাঁত নেই। রঙ উজ্জ্বল লাল। আর ডানার পাশ দিয়ে হাতের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আছে। ডাঙায় হাঁটার সময় সেটায় ভর করে হাঁটে। এরকম কোনও জীবের অস্তিত্বের কথা আমরা জানা ছিল না। সবথেকে অবাক ব্যাপার—আমরা যে ওকে ধরেছি, ওর কোনও ক্ষতি করতে পারি, এরকম কোনও বোধই ওর মধ্যে নেই। দিব্যি আনন্দে আমাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

খানিকবাদে হঠাৎ দেখি ক্যাপ্টেন- আমাকে ডাকছে। দূরবিন হাতে খানিকটা দূরে জলের দিকে কী দেখাচ্ছে। দূরবিন চোখে দিলাম। আমাদের ধরা ওই প্রাণীটার মতোই একঝাঁক প্রাণী সাঁতরে যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়! আমরা ওই ঝাঁকটার পিছু নিলাম।

দেখা যাক ওরা কোথায় যায়। আমাদের ধরা প্রাণীটাকেও খানিকবাদে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। ও গিয়ে ঝাঁকের মধ্যে মিশল।

মিনিট কুড়ি বাদে দেখলাম, আমরা একটা সবুজ তটভূমির দিকে এগোচ্ছি। আমাদের ম্যাপে এই দ্বীপের কোনও চিহ্ন নেই।

আমরা দ্বীপের দিকেই এগোলাম। দ্বীপটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সমুদ্র থেকে সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। সমুদ্রের নিচ থেকে হঠাৎ করে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে শুনেছি এরকম ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। হয়তো বেশিদিন হল এই দ্বীপ সৃষ্টি হয়নি। তাই এর অস্তিত্বের কথা সবার অজানা।

দ্বীপের ধার দিয়ে বেশ খানিকটা ঘোরার পর, খানিকটা সমতল তটভূমির সন্ধান পাওয়া গেল। এখান দিয়ে হেঁটে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যাবে। জাহাজ নোঙর করে আমরা ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ্য করলাম এখানকার গাছগুলো ভিন্ন প্রজাতির। আর সব গাছেই কিরকম একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। খুব তীব্র পারফিউমের মতো। পথে কয়েকটা জলাশয় পড়ল। বিশ্রাম নেবার জন্য একটা জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল দ্বীপটার মধ্যে কিন্তু একটাও জীবজন্তুর দেখা পেলাম না। প্রাণহীন দ্বীপ নাকি? ভাবতে-ভাবেতই হঠাৎ দেখি ঝোপের ভেতর থেকে একটা হরিণশ্রেণীর প্রাণী বেরিয়ে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হরিণশ্রেণী বলছি, কারণ হরিণের মতো রঙ নয়, গাঢ় নীল। আমি প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু আমাকে দেখে ও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। উল্টে ও যেন আমার মতোই একইরকম কৌতূহলে আমাকে মুখ তুলে দেখতে লাগল। ওর এই অদ্ভুত রঙের জন্য খুব সহজেই অন্য প্রাণীর শিকার হয়ে

উঠতে পারে।

সব জায়গাতেই কিছু লোক থাকে যারা বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কোনও কাজ করে না। ক্রিস পেচি ওরকমই একজন। হঠাৎ করে কোথা থেকে ক্রিস পেচি ছুটে এসে প্রাণীটাকে গাছের ডাল নিয়ে তাড়া করল। অবশ্য তাড়া করায় আমার ভালোই হল। দেখলাম এই প্রাণীটার হরিণের সঙ্গে আরেকটা তফাত আছে। তা হলো—এই প্রাণীটা হরিণের দশভাগের একভাগ বেগেও ছুটতে পারে না।

সেদিন আমরা ঠিক করলাম জাহাজে না ফিরে তাঁবু খাটিয়ে দ্বীপেই রাত কাটাব। তেমন হিংস্র কোনও জানোয়ার এ-দ্বীপে আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য অনেক অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।

রাতে খাবার পর আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে বসলাম। কী অপূর্ব এই দ্বীপ। পাহাড় হ্রদ-সমুদ্র সবুজে-ঢাকা উপত্যকা—কী নেই এ-দ্বীপে। কেউ যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য এক জায়গায় এনে জড়ো করেছে। কিন্তু এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কোনও কিছু একটার যেন অভাব আছে। আর তাই বোধহয় সামনের পাইনের বনে ঝাঁপিয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখেও মন খারাপ লাগছিল।

তিন বছর হল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি, বাবা-দাদা কে কেমন আছেন কিছুই খবর পাইনি। কী লাভ হয়েছে এই তিন বছর জাহাজে করে দেশ-বিদেশ ঘুরে। নানান ধরনের জীবজন্তু, গাছপালা আর জীবাশ্মের সন্ধানে জীবনের তিনটে মূল্যবান বছর হারিয়ে বসে আছি। জীবজগতের এই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না-কেন, এইটুকু বুঝেছি আমার নেই।

আমার পাশে বসে আছে কেন ডারিংটন। মাঝারি চেহারা। জাহাজের

কলকব্জা খুব ভালো বোঝে। মেনটেন্যান্সের জন্য ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। সারাক্ষণ হইচই করতে ভালোবাসে। তা সে-ও দেখছি মনমরা হয়ে বসে আছে। দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। হুঁ-হুঁ বলে কাটিয়ে গেল। বুঝলাম ওর মনের অবস্থা ভালো নেই।

এরমধ্যে খানিকক্ষণ ধরে একটা খস-খস আওয়াজ শুরু হয়েছে। মাঝে-মাঝে পাচ্ছি, মাঝে-মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেন্-ই আবিষ্কার করল—শজারু। আমার ঠিক দুফুট দূরে নির্ভয়ে বসে আছে। ভয় অবশ্য আমরাই পাওয়ার কথা। কাঁটা ফুটলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু সতর্ক হবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। কেন্ কী একটা ফল খাচ্ছিল। তারই আকর্ষণে কিনা জানি না হঠাৎ করে কেন্-এর গা ঘেঁষে শজারুটা গিয়ে বসল। কেন্ও চমকে উঠেছিল। কিন্তু এবার আমার চমকে ওঠার পালা। কেন্ শজারুটাকে কোলে তুলে দিব্যি আদর করছে। খানিকবাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে ও বলে উঠল,—ডারউইন, হাত দিতে পার। এটা শজারু নয়। এর কাঁটাগুলো একেবারে নরম। হাত দিলে বেশ আরাম হয়।

একটু দ্বিধা নিয়ে কেন্-এর কথামতো শজারুটার গায়ে হাত দিলাম। আশ্চর্য, কাঁটাগুলো শজারুর মতো শক্তও নয়, বিঁধেও যায় না। খুব নরম লম্বা-লম্বা রোমের উপর হাত দিলে যেমন লাগে সে-রকম। আর এ-প্রাণীটাও সত্যি অদ্ভুত। এরও কোনও ভয়ডর নেই। দিব্যি নিশ্চিন্তে আমাদের মাঝখানে বসে রইল। যেন আমাদের পোষমানা, আমাদের সান্নিধ্য উপভোগ করছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও বাড়ছে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে তাই মোমবাতির আলোয় ডায়েরি লিখতে বসেছি। খানিকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে-ভাবনাটা শুরু হয়েছে সেটা আর আজকে লিখলাম না। কালকে দেখা যাবে সেটা নেহাতই অমূলক কিনা।

অক্টোবর ৪ সন্ধে আটটা

দুদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। জানি না আমিও এই দ্বীপ ছেড়ে বেরতে পারব কিনা। নাকি আমার অবস্থাও কেন্, রোজ, ডেভ, জনের মতো হতে চলেছে। আর তাই এই ডায়েরি-লেখাটা আরও বেশি প্রয়োজন। যাতে লোকে এরকম একটা ব্যতিক্রমী জায়গার অস্তিত্বের কথা জানতে পারে।

শুরু করা যাক কাল সকাল থেকে। পরশু রাতে কেন্-এর নাক - ডাকা ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। শজারু শ্রেণীর প্রাণীটাও আমাদের তাঁবুর মধ্যে এসে শুয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় চলে গেছে।

আরেকটু পরে আমরা দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে বেরলাম। দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে। গাছ থেকে যে-গন্ধটা পাচ্ছিলাম, সেটা যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া ট্রপিকাল না হলেও যে-জঙ্গলটায় ঢুকলাম তার সঙ্গে ট্রপিকাল ফরেস্টের অনেক মিল। আকাশ ছোঁয়া লম্বা-লম্বা গাছ সূর্যের মুখ দেখতে দেয় না। তবে এ-ধরনের বনে জীবজন্তু, পশুপাখি অজস্র থাকে। এখানে কিন্তু সে-রকম কিছু চোখে পড়ল না। একটা গাছের উপর খালি একটা শকুন বসে থাকতে দেখলাম। খানিকবাদে একটা সাপ চোখে পড়ল। নেতিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিং কোবরা। সাপের রাজাকে এ-রকম নিস্পৃহভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেও ফণা না-তুলে আস্তে-আস্তে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অসুস্থ হবে হয়তো।

ওদিকে ডেভ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—লাল ইঁদুর।

ওর অঙ্গুলিনির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। সাপটার থেকে হাতদুয়েক দূরে টকটকে লাল রঙের ইঁদুর। শিকার ও শিকারির

এভাবে পাশাপাশি বসে থাকা কল্পনা করা যায় না। যেন দুজনেই অন্য কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ইঁদুরের রঙ মেটে হলে চট করে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে লাল বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

আমার মাথার মধ্যে সব চিন্তাধারা কিরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি আমার এতদিনের পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা সবই মিথ্যে? বিভিন্ন দেশের অজস্র জীবজন্তু উদ্ভিদশ্রেণী দেখে আমি সিদ্ধান্তে আসতে চলেছিলাম যে প্রত্যেক জীব তার জীবনধারণের জন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরিবর্তন ঠিক দিকে হলে সেই জীব এই জীবজগতে টিকে যায়। না হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেক দেশের পুমার চেহারা তাই এক-একরকম। একেক দেশের হামিংবার্ড একেক রকম। কিন্তু এখানে যেন সবকিছুই অন্যরকম। কারও কোনও আত্মরক্ষার অস্ত্রই নেই। তবু তারা কীভাবে যে জীবনসংগ্রামে টিকে আছে এটাই আশ্চর্য।

এসব ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে থাকলাম। খানিকবাদে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটা থেকে চারদিকে বেশ কয়েকটা পাহাড় উঠে গেছে। একটা কম-খাড়া পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

বেশ খানিকটা ওঠার পর জঙ্গল কিছুটা কমে গেল। আমরা ওই পাহাড়ের প্রায় উপরে উঠে গেছি। দ্বীপের বেশ খানিকটা জায়গা এখান থেকে দেখা যায়। সবুজ বনভূমির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লেকগুলো উপর থেকে দারুণ লাগছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এরই মধ্যে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। একবার নয়, তিন-তিনবার। ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি জনের বন্দুক থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর ওর থেকে মোটামুটি কুড়ি হাত দূরে একটা চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে। চিতাবাঘটা

নাকি পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আস্তে-আস্তে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটাকে কাছ থেকে দেখলাম। অদ্ভুত। এর পায়ের পেশী দেখে মনে হয় না এ গাছ বেয়ে উঠতে পারে। আমার এ-বিষয়ে অনেক পড়াশুনো আছে। দেখে মনে হল না এ খুব জোরে ছুটতে পারে। শরীরের গঠন সে-রকমভাবে গড়ে উঠেনি।

চিতাবাঘটা যেদিক দিয়ে এসেছিল, আমরা ঝোপ সরিয়ে-সরিয়ে সেদিকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা এগোবার পরে আরেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারদিকে বেশকিছু চতুস্পদ প্রাণীর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটু দেখতেই বুঝলাম, এগুলো অন্য কোনও প্রাণীর নয়, চিতাবাঘের। তবে একটা নয়। বেশ কিছু চিতাবাঘের। কী ব্যাপার। এখানে কি কোনও দাবানল লেগেছিল। চারদিকের গাছ-মাটি দেখে তো অন্তত মনে হয় না! তাহলে কি আরও কোনও শক্তিশালী প্রাণীর শিকার হয়েছে এরা? কে জানে?

বেলা অনেক হয়ে গেছে। সবার খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তাঁবুর উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করলাম।

দুপুরে খাওয়াটা বেশ জব্বর হল। টার্কির রোস্ট হয়েছিল। খাওয়ার পরে বিশ্রাম না-নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। একটু অন্যদিকে। সবাই খুব হতোদ্যম। বেরনোর আর উৎসাহ নেই, তাই একাই বেরোতে হল।

বনের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা হথহর্ন গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। গাছের সেই বিদঘুটে গন্ধটা মনকে কেমন অবসন্ন করে দিচ্ছে। বেঁচে থাকা বা না-থাকা, কাজ করা বা না-করা সবকিছুতেই কেমন যেন নির্লিপ্তি গড়ে উঠেছে। জীবনকে সেই মুহূর্তে এতটাই অর্থহীন মনে হল যে-গাছের তলাতে বসেই রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে

গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো ভয় পেয়ে যেতাম। একা এই ঘন-বনে রাত কাটানো। কিন্তু তখন সেই ভয়ও নেই। রওনা হলাম তাঁবুর উদ্দেশ্যে। কিন্তু চাঁদের আলোতে এই বনবনানীর মধ্যে দিয়ে ঠিক পথ খুঁজে পেলাম না। ঘণ্টাখানেক এদিকে-ওদিক ঘোরার পরে বুঝলাম পথ হারিয়েছি। সকাল হবার আগে ফেরার চেষ্টা করা বৃথা।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত না-কাটিয়ে একটু খোলা জায়গায় থাকা ভালো। তারই সন্ধানে এগোতে গিয়ে মনে হল দূরে কিন্তু আলো দেখা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ এগোবার পরে যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম তা লিখে বোঝানো মুশকিল। খানিকদূরে একটা লেক দেখা যাচ্ছে। আর সেই লেকের ধারে প্রায় একলক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যেরকম গুহামানব ছিল বলে ধারণা করা হয়, সে-রকম বেশ কিছু লোক। বিশাল-বিশাল লোমশ চেহারা। ঘাড় বলে কোনও বস্তু নেই। হাঁটু অবধি লম্বা হাত।

ওদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা জাতীয় কিছু হচ্ছে বলে মনে হল। একইধরনের ছোট-ছোট কাঠ এক জায়গায় জড়ো করে মাটিতে রাখা আছে। এক-এক করে জনাদশেক লোক এসে যে-যার মতো কাঠ নির্বাচন করল। এবার উলটে কাঠের অন্যদিক দেখতে লাগল। মনে হল অন্যদিকে কিছু একটা চিহ্ন আছে। একজনকে হঠাৎ খুব আনন্দিত ও উত্তেজিত মনে হল। বোধহয় সেই ঠিক কাঠ নির্বাচন করে জিতেছে। একজন প্রধান-জাতীয় লোক এসে সেই লোকটার গলায় কাঠের টুকরো দিয়ে বোনা একটা মালা পরিয়ে দিল।

লেকের ধারে একজায়গায় বেশ কিছু কাঠ জড়ো করে চিতার মতো করা ছিল। লোকটা গিয়ে শুয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েকটা লোক লতাপাতা দিয়ে লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কাঠের সঙ্গে বাঁধল। আরও কিছু

কাঠ চাপানো হল। কী হতে চলেছে বুঝতে পারছি না। এবার একটা মেয়ে এসে ওই কাঠের উপর কী একটা তরল ছড়িয়ে চকচকি ঘষে আগুন লাগানোর চেষ্টা শুরু করল।

কী হতে চলেছে। পুরস্কার হিসেবে জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হচ্ছে? এখানে কি তবে মৃত্যুটাই সবথেকে আকাঙিক্ষত পুরস্কার?

এসব ভাবছি, ইতিমধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে সুর করে মন্ত্রজাতীয় কিছু একটা বলতে লাগল। তার মানে এরা একেবারে অনুন্নত নয়। এদের ভাষা আছে। হয়তো লিখতেও পারে। কারণ কাঠের উলটোদিকে কোনও একটা লেখা বা সংকেতজাতীয় কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই।

মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে ওরা সবাই গোল হয়ে আগুন ঘিরে বসল। কারওর মুখে কোনও কথা নেই। হাসি নেই। এ-এক অদ্ভুত সভা। আমিও যে কতক্ষণ বসেছিলাম কে জানে।

সকাল হতে ওই লোকগুলো উলটোদিকের বনে ঢুকে গেল। আমাকেও আশা করি ওরা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। মনে হল ওদের পিছু নিই। ওদের সম্বন্ধে আরও জানা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য! উৎসাহ পেলাম না। মনে হল এখানেই বসে থাকি। আরও ঘণ্টাখানেক পরে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। খিদে পেয়েছে, ফিরতেই হবে।

ফিরতে-ফিরতে আরও একঘণ্টা হয়ে গেল। পরপর অনেকগুলো তাঁবু, আমাকে আসতে দেখেই ক্যাপ্টেন ফিৎজ্‌রয় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল,—কাল রাতে কোথায় ছিলে? আমি প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোমার অবস্থাও কেন্, ডেভের মতো হল কিনা।

একটু থেমে ফিৎজ্‌রয় ফের বলে উঠল,—না, না এ-দ্বীপে আর

নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। সবাই কিরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

—কেন্, ডেভের কী হয়েছে?

—শুধু কেন্, ডেভ! কালকে সন্ধে থেকে তোমাকে নিয়ে সবসুদ্ধ আটজন নিখোঁজ। রাত আটটা নাগাদ তোমরা কেউ ফিরলে না দেখে আমরা মশাল নিয়ে বেরোলাম। কালকে দুপুরে যেদিকে গিয়েছিলাম, সেদিকেই তোমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে ওদিকে এগোলাম। কালকে আমরা যদ্দুর গিয়েছিলাম তার থেকে আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে গেলাম চড়াই পথে সামনের পাহাড়গুলো বেশ ন্যাড়া, গাছ কম তাই দূর থেকে হঠাৎ কেন্ আর ডেভকে দেখতে পেলাম। ওরা দুজনেই বিপজ্জনকভাবে পাহাড়ের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে কেন্‌কে ধরে ফেললেও, ডেভকে ধরতে পারিনি। তার আগেই নিচে ঝাঁপ দিয়েছে। ওর কোনও চিহ্নই নেই। খাড়া পাহাড়টার নিচের দিকে জঙ্গল। তারমধ্যে উপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কেন্-এর তখনও ঘোর কাটেনি। বারবার বলে চলেছে, আমি মরতে চাই, আমি মরতে চাই। কালকের পর থেকে এখনও অবধি ওর ওই অবস্থা চলছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

—আর ডেভ?

—আমরা পাহাড়ের থেকে নেমে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। ডেভের মৃতদেহ পেলাম না, তবে যা দেখলাম তা বিস্ময়কর। চারদিকে হাজার-হাজার কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরাও প্রত্যেকে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। কতধরনের প্রাণীর কঙ্কাল যে ছড়িয়ে আছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। কিছু-কিছু কঙ্কাল তো আমার পরিচিত সব প্রাণীর বলে মনে হল। মনে হল ওই জায়গাটা সবাই

সুইসাইড-স্পট হিসেবে ব্যবহার করে। ওখান থেকে আমরা সোজা ফিরে এলাম। রাত অনেক হয়ে গেছিল। সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন, মন খারাপ। বাকিদের খোঁজ এখনও পাইনি। ...তা তোমার কী খবর?

আমিও আমার রাতের অভিজ্ঞতা ফিৎজ্‌রয়কে খুলে বললাম।

বললাম—আমার মনে হয় এ-দ্বীপের পরিবেশে এমন কিছু আছে, যার জন্য এই দ্বীপের জীবজন্তুদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। হয়তো তারা বেঁচে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। আরেকটা জিনিসও লক্ষ্য করার মতো। এ-দ্বীপের গাছ, পশুপাখি পৃথিবীর বাকি যে-কোনও জায়গার থেকে একদম অন্যরকম। আমার মনে হয় এ-দ্বীপে বেশ কিছুদিন থেকে এখানকার জীবজন্তুদের স্টাডি করা দরকার।

আমার কথা থামিয়ে ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল,—ডারউইন, তোমার মতো শুধু গবেষণা করতে আমি আসিনি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার সহযাত্রীদের সাবধানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর তাই আমার ইচ্ছে কালকেই এ-দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। কাল সকালেই। সবাইকে আমি এই দ্বীপে হারাতে চাই না।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা বাকি পাঁচজনের খোঁজে বেরুলাম। দ্বীপের বেশ কিছু জায়গা একেবারে দুর্গম। দিনের শেষে আমরা যখন ফিরে এলাম তখন ওই পাঁচজনের খোঁজ তো পাওয়া যায়ইনি, উলটে আরেকজন খালাসিকেও শুনলাম সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে-ও নিখোঁজ।

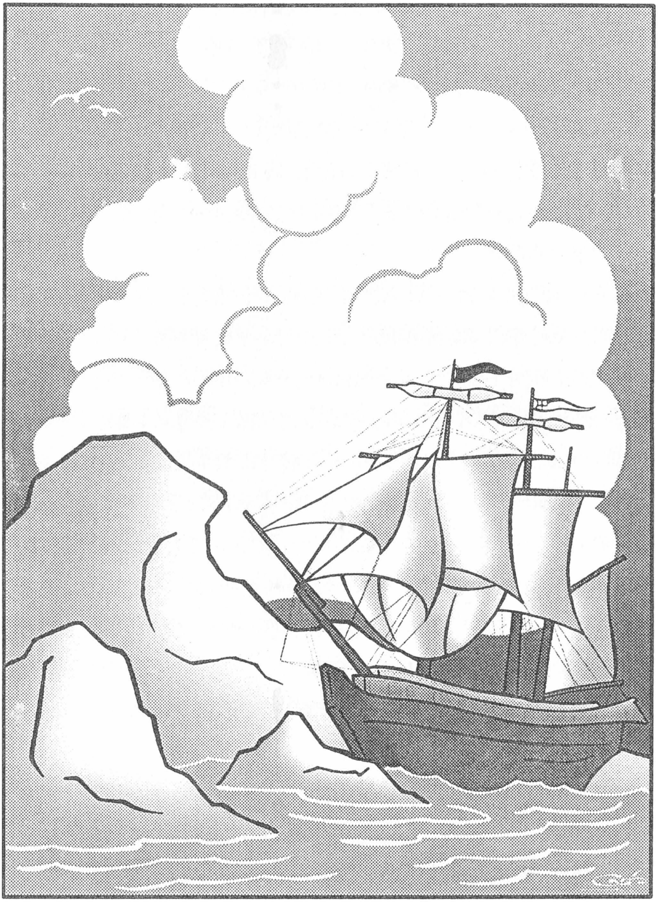
সত্যিই এ অভিশপ্ত দ্বীপে আর থাকা উচিত হবে না। অন্তত সব সহযাত্রীদের ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

অক্টোবর ৬, সকাল দশটা

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ডাল পারেসোতে পৌঁছে যাব।

অদ্ভুত ব্যাপার। দ্বীপ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার সবার মধ্যে সেই নির্জীব ভাবটা কেটে গেছে। আমারও। মনে হচ্ছে জীবনটা কত মূল্যবান। তবে ওই দ্বীপের কথা এখনও মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। গত কয়েকদিনের কথা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে কিনা জানি না। দেশে ফিরে ওই দ্বীপের কথা বললে, জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই আমার জীবজগতের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে টিঁকে থাকার তত্ত্বের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।

জীবজগতের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্য যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে না পারলে সেই জীব হারিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়। খালি শক্তিমানেরাই টিকে যায়। কিন্তু এই দ্বীপে সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রম। তার কারণ এ-দ্বীপের প্রত্যেকটা জীব-মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। অভিশপ্ত জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক এই কামনা করে। তাই কোনও জীবনসংগ্রাম নেই, কোনও প্রতিযোগিতা নেই, লড়ে বেঁচে থাকার তাগিদ নেই। এ-ধরনের পরিবেশে কি দরকার অভিযোজনের? কি দরকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর? এখানে তাই শক্তিমানেরা হারিয়ে যায়। তারা আত্মঘাতী হয়। পড়ে থাকে তারাই- যারা দুর্বল, যারা নিরীহ। যেমন আমার হাতে ধরা এই শজারুটা, আমাদের সেই প্রথম দিনের বন্ধু।



নতুন জুতো

বিল্টুদা ঠিকই বলেছিল সেদিন। ভিজে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে ছিল বিল্টুদা, মানস জিজ্ঞেস করেছিল, অমন করে কী দেখছ বিল্টুদা?

পরিবর্তন—প্রতিমুহূর্তে দেখ আকাশের ছবিটা কেমন পালটে পালটে যাচ্ছে, কখনও একটা ধূসর-কালো মেঘ সাদা মেঘটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে—তো কখনও সাদা মেঘটা আবার নীল আকাশকে জায়গা দিয়ে অন্য একটা মেঘের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আর কতরকম আকার দেখ। সব সময় পালটাচ্ছে। ইঁদুর, ডাইনোসর, ড্রাগন, জিরাফ—সবরকম শেপ খুঁজে পাবি। আমাদের রোজকার জীবনও এরকম। কখনও ভালো-কখনও খারাপ। তাই কখনও চিন্তা করবি না। খারাপ সময় বেশিক্ষণ থাকে না।

কথাটা তখন মনে ধরেনি মানসের। কই—রোজই তো একরকম। ভোরবেলায় ওঠো, পড়ো, তারপর স্কুলে যাও। বিকেলে একটু খেলা—ফিরতে দেরি—তারপর একটু বকুনি। পড়া—একটু টিভি—লোডশেডিং—রাতের খাওয়া—ঘুমোনো। কিন্তু নাহ্, আজকের দিনটা ঠিক বিল্টুদার কথামতো সব মিলে যাচ্ছে। মানস ওর হাতের জুতোর

বাক্সের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। কী সুন্দর বাক্স! আর খুললেই কীরকম মন মাতানো গন্ধ! তবে ওর মধ্যে নতুন জুতোটা নেই। আছে সাতবার সেলাই করা একটি চটি। কতবার স্কুলে এ চটিটার জন্য বন্ধুরা ঠাট্টা করেছে।

আর জুতোটা? নতুন জুতোটা আছে ওর পায়ে। কী সুন্দর! কালো আর সাদা রঙের স্নিকার। উপরে লাল স্ট্র্যাপ। পা ঢুকিয়ে স্ট্র্যাপটা টেনে দিলেই হল। কোনও ফিতে নেই—বারবার ফিতে খুলে খাওয়ার ঝামেলা নেই! আর কী আরাম! মনে হচ্ছে নরম ঘাসের উপর পা রেখেছে। নাহ্, ঘাসও নয়। তার থেকেও ভালো, কীরকম গদি-গদি। জুতোটার উপর বারকয়েক সস্নেহ হাত বোলাল মানস। জুতোটা পরে স্কুলে যাবে—ভাবতেই মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সবাই হাঁ করে দেখবে। আর অরূপ যে বারবার ক্ষেপায় ছেঁড়া চটির জন্য—কথাই বলতে পারবে না। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নিজের মনেই হেসে উঠল মানস।

অথচ সকালটা আজ এত সুন্দরভাবে শুরু হয়নি। যদিও হওয়া উচিত ছিল। আজ ওর জন্মদিন। কতদিন আগে থেকে—হ্যাঁ, তা সাত-আট মাস তো হবেই—মা বলেছিল নতুন জুতো কিনে দেবে। কতদিন আর ছেঁড়া চটি সেলাই করে করে স্কুলে পরে যাওয়া যায়। সামনের হাঁ-টা বন্ধ হয় তো—ডানদিকের ফিতেটা জবাব দেয়। ঠিক এক মাস আগে মা জানাল যে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। জন্মদিনেই জুতো কেনা হবে। তা সেইভাবেই রোজ দিন গুনেছে মানস। এমনকি ইতিহাসের বইয়ের পাতায় ১, ২ করে টিকও দিয়েছে। কালকে ছিল ৩০। আনমনে শাজাহানের ছবিটার উপর পেনসিল দিয়ে একটা জুতো এঁকে ফেলেছিল ও। কাল সারারাত ছটফট করেছে। স্কুল থেকে ফিরেই মায়ের সঙ্গে জুতো কিনতে যাবে।

তাই সকালে স্কুলের পোশাক পরে মাকে ওই কথাটাই জিজ্ঞেস



করেছিল ও—মা, কখন যাব জুতো কিনতে?

মা কাজ করতে করতে সাড়া দিয়েছিল—ফিরে এসো, তারপর বলব।

অবাক হয়ে ব্যাগ ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল মানস। কারণ, ও জানে মায়ের এ কথাটার একটাই মানে হয়। তা হল আজকে হবে না। এরকম অনেক-অনেকবার শুনেছে ও।

—মা, তুমি কিন্তু আজকেই কিনে দেবে বলেছিলে।

—সোনা, পরে কথা বলব। তুমি স্কুলে যাও। ঠিক একদিন কেনা হবে।

ইচ্ছে করেই মা মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে কথা বলছিল। ব্যাগ ছুড়ে ফেলেছিল মানস।

—আজকেই কিন্তু কিনতে হবে মা। না হলে আমি আর স্কুলে যাব না—আর কখনওই যাব না।

উত্তর পায়নি মানস। মা রান্নাঘর মুছছিল।

—তুমি কখনও আমার চটিটা পরে দেখেছো? ওটা পরা যায়! অর্ধেকটা পা মাটিতে বেরিয়ে থাকে। ক্লাসের সবাই আমাকে ছেঁড়া-চটি বলে ডাকে।

উত্তর না পেয়ে এবার রান্নাঘরে মায়ের পেছনে ধাওয়া করেছিল মানস।

—তুমি মিছে কথা বলো মা—সবসময়ে মিছে কথা বলো। বলো, কতদিন ধরে তুমি বলেছিলে যে নতুন জুতো কিনে দেবে।

মা কথা এড়িয়ে বলে উঠেছিল—আজ পায়েস করব। স্কুল থেকে এসে খেয়ো।

—তোমার পায়েস তুমিই খেয়ো। আর বোনটিকে দিয়ো। আমার ওসব দরকার নেই। তুমি এক নম্বর মিথ্যুক। তোমার কোনও কথা আর

নতুন জুতো

আমি বিশ্বাস করব না—চিৎকার করে উঠেছিল মানস।

এবার গালে চড় পড়েছিল—বেশ জোরেই।

—চুপ! ধমকে উঠেছিল মা—আস্তে কথা বল। খালি জুতো আর জুতো। বাঁদর কোথাকার। দেখিসনি—বাবা কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। শুয়ে আছে সমানে। ডাক্তার দেখানোর সামর্থ্য নেই! যেখানে গাড়ি চালাত—দু-দিন আগে সে কাজটাও গেছে। আর উনি জুতো কিনবেন।—চুলের মুঠি ধরে আবার চড় মেরেছিল মা।

—বোনটাকে দেখেছিস? স্কুলে যাওয়ার একটা ভালো পোশাক পর্যন্ত নেই। কতদিন ধরে ওই এক সেলাই করা জামা পরে স্কুলে যাচ্ছে। রাস্তায় ছেলেছোকরারা টিটকিরি দেয়। কই, সে ব্যাপারে তো হুঁশ হয় না। শুধু আমার-আমার—পিঠে আরেকটা কিল বসিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল মা।

—পরের মাস থেকে আমাকে বাসন মাজার কাজ খুঁজতে হবে। কোনও জন্মে যা করিনি—তাই করতে হবে—তা না হলে এ ঘরের ভাড়া মেটাবে কে?

আর দাঁড়ায়নি মানস। আজকেই এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। কোনও কথাই ওর মাথায় ঢুকছিল না। চটিটা পায়ে গলিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ও। মায়ের ডাকও শোনেনি। তারপর অলি-গলি পেরিয়ে — ময়লা ফেলার জায়গাটা পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

স্কুলের দিকে না গিয়ে তার উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করল মানস। আজ থেকে উলটো পথে হাঁটবে ও। শুধু বোনের উপর সবার বেশি দরদ। মানস না হয় বছর দুয়েকের বড়ো। কিন্তু তা বলে ওর কোনও আবদার-ইচ্ছে থাকবে না? এই তো কয়েকদিন আগে বিশ্বকর্মা পুজো গেল। ওরও তো ইচ্ছে ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর। কয়েকবার বলেওছিল। কিন্তু কেউ যেন শুনতেও পায়নি। কই, তা নিয়ে তো ও আর কোনও

বায়না করেনি। সারাদিন ঘুড়িতে ছাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে কখন একটা কাটা ঘুড়ি ওর দিকে মাটিতে নেমে আসবে। তা সে আর হয়নি। আর ওর পড়ার বইগুলো? সব কটা পুরোনো। কয়েকটাতে সব কটা পাতাও নেই। তা নিয়ে কখনও মায়ের কাছে বলেছে নতুন বই চাই! তবুও...!

এসব ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ যে হাঁটছিল তা খেয়াল নেই মানসের। বেশ কয়েকটা বড়ো রাস্তার মোড় পেরিয়ে এসেছে। তারপর একটা চারমাথায় মোড়ের থেকে খানিকটা দূরে একটা বেঞ্চিতে বসেছিল ও। ইতিমধ্যে বেলা বেড়েছে। শহরটা যেন হঠাৎ করে জেগে উঠেছে। চারদিকে ব্যস্ত অফিসযাত্রীর ভিড়। অটোর বিশাল লাইন। বাসে বাসে রেষারেষি। লোকেরা চারদিকে ছোটাছুটি করছে। ধাক্কাধাক্কি, ঝগড়া।

হঠাৎ মানসের চোখে পড়ল এই ছোটাছুটি-হুটোপুটির মধ্যেই রাস্তার উলটোদিকের বেঞ্চিতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, :চাখে ভারী চশমা। বয়স সত্তরের মতো হবে। মাথা ভরতি পাকা চুল। ওঁর পায়ের কাছে ছাতাটা পড়ে আছে। আর উনি মুখ নিচু করে ডান হাতটা বুকের উপর রেখে বসে আছেন। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। মাঝে মাঝে বাঁ হাতটা বেঞ্চির উপরে রেখে যেন উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পারছেন না। কিন্তু তার জন্য আশপাশের ছবিতে কোনও পরিবর্তন নেই। এ অবস্থা দেখেও কেউ এগিয়ে আসছে না। যে যার মতো আশপাশ থেকে হেঁটে চলে যাচ্ছে। ওঁর পাশেই বেঞ্চিতে আর একজন লোক বসে ছিল। ভাবগতিক ভালো না বুঝে, সেও উঠে হাঁটা দিল।

মানব ছুটে রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোককে ধরে ধরে পাশেই এক ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার কী বলল তা পুরোটা না

বুঝলেও এটুকু বুঝেছে যে ও না থাকলে আজ ভদ্রলোককে বাঁচানো মুশকিল হত। ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরল ওরা। সোজা ওঁর বাড়ি।

দাদুর ফ্ল্যাটটা বেশ একটা বড়ো কমপ্লেক্সের মধ্যে। দাদু একাই থাকেন। একজন কাজের লোক আছে। এক মেয়ে। সে বাইরে থাকে বহুদিন। চারদিকে প্রচুর বইপত্র ছড়ানো।

দাদু একটু সুস্থ বোধ করলে প্রশ্ন না করে পারেনি মানব—'আপনি কি স্কুলে পড়াতেন দাদু?'

দাদু জানিয়েছিলেন—স্কুলে না, কলেজে। প্রেসিডেন্সির নাম শুনেছ? ওখানেই।

—ওরেব্বাবা। শুনেছি, ওটা তো খুব বড়ো কলেজ। আর ওটা কীসের মেডেল দাদু?

—রাষ্ট্রীয় পুরস্কার—প্রফেসর হিসেবে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দাদু। ফের বলতে শুরু করলেন—জানি না এর মূল্য কী! অনেক বছর পড়িয়েছি। ভালো ছাত্র হয়তো তৈরি করেছি—ভালো মানুষ তৈরি করিনি। ওটা অনেক শক্ত কাজ। দেখলে তো, আমি যখন বুকের যন্ত্রণায় ওরকম কাতরাচ্ছিলাম—একজনও এগিয়ে আসেনি। ভালো মানুষ হওয়া সবার আগে দরকার। তোমার মতো।

কথাটা শুনে অবাক লেগেছিল মানসের, ও যে ভালো মানুষ এটা তো আগে কেউ বলেনি। দাদুর সঙ্গে ও অনেক কথা বলেছিল। বাড়ির খবর, স্কুলের খবর। শুধু আজকের সকালটার ব্যাপারে আর কিছু বলেনি। খানিক বাদে দাদুর সঙ্গে আরও গল্প করার পর যখন বেরোতে যাবে, তখন দাদু দরজার কাছে এসে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—তুমি অনেক বড়ো মানুষ হবে। এই টাকাটা রেখে দাও। ট্যাক্সি করে বাড়ি

যেয়ো। এমন কেউ নেই যে তোমার সঙ্গে পাঠাব। সাবধানে যেয়ো। বাড়ির সবাইকে নিয়ে একদিন এখানে এসো।—বলে মানসের জামার পকেটে দাদু টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

মানসের যে একটু লজ্জা লাগেনি, তা নয়। তবুও প্রতিবাদ করেননি। সত্যিই যদি বাড়ি অনেক দূর হয়। তখন তো আর হেঁটে ফেরা যাবে না। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে নোটটা বের করেই অবাক মানস। দু-দুটো পাঁচশো টাকার নোট। বড়ো বড়ো করে মাঝখানে ৫০০ লেখা আছে। মাঝামাঝি একটা দাগ চকচক করছে। আর ডান পাশে গান্ধিজীর চশমা পরা মুখটা জ্বলজ্বল করছে। আগে কখনও দশ টাকার বেশি হাতে ধরে দেখেনি মানস। কী করবে এত টাকা দিয়ে?

তখনই মনে হল জুতোটার কথা। যা ভাবা তাই কাজ। জিজ্ঞেস করে করে এ পথ-ও পথ হেঁটে হেঁটে এক ঘণ্টার মধ্যে মানস ঠিক পৌঁছে গেল ওই দোকানটাতে। কতদিন স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে দোকানটার শোকেসে নাক ঠেকিয়ে জুতোটা দেখেছে মানস। কাচের দরজা ঠেলার সাহস আর হয়নি। আজ খানিকটা দ্বিধা নিয়েই শোরুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল মানস। ছেঁড়া চটি দেখে এরা কিছু বলবে না তো? কিন্তু না—ছেঁড়া চটি নিয়ে কিছু না বললেও ওরা অবশ্য জিজ্ঞেস করছিল বড়ো কেউ সঙ্গে নেই কেন। প্রশ্নটা কোনওরকমে এড়িয়ে গেছে মানস। মিনিট দশেক বাদে ও বেরিয়ে এসেছিল। নতুন জুতোটা পায়ে পরে আর ছেঁড়া চটিটা বাক্সে নিয়ে। তারপরেই পাশের পার্কটাতে বসেছে। বকুল গাছের তলায়। জুতোটায় আরেকবার হাত বোলাল মানস। উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা হেঁটে এসে আবার বসে পড়ল। হাঁটছে বলে মনেই হচ্ছে না। যেন পায়ের তলায় ভেলভেট। লাফালেও পায়ে লাগছে না। ঠিক এরকম একটা জুতো যদি বোনের জন্য কেনা যায়—কী খুশিই না হবে। ওর

জুতোটা—ওটাও তো ছিঁড়ে গেছে। বেশ কয়েকবার ও নিজেই মুচির কাছে গিয়ে সারিয়ে এনেছে। কিন্তু সেটা কি আর এই টাকায় হবে! মেয়েদের জুতোর দাম আরও বেশি হয়। আর বাবার ডাক্তার দেখানো?

কত টাকা বাকি আছে? একবার হিসেব করে নিল মানস। মনে হয় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ওষুধ কিনতে হয়? গতকাল বাবার বিছানার পাশে কিছুক্ষণ বসে ছিল মানস। বাবা কোনও কথা বলেনি, শুধু ডান হাত দিয়ে ওর হাতটা ধরেছিল। আর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল নেমে এসেছিল গালের উপরে। মানসও কোনও কথা বলেনি।

খানিক বাদে উঠে এসেছিল। বাবার অসুখটা কি খুব বড়ো কিছু?

জুতোটা পা থেকে খুলে নিল মানস। নীচটা কাদামাটিতে একটু নোংরা হয়েছে। ঝরে পড়া কয়েকটা পাতা কুড়িয়ে জুতোর তলাটা পরিষ্কার করে ও ছেঁড়া চটিটা আবার পরে নিল। এ জুতো ওর দরকার নেই। ফেরত দিয়ে দেবে। ফের হাঁটতে শুরু করল দোকানটার দিকে। হাতের বাক্সে এখন নতুন জুতো।

বিনোদবাবুর আসর

খবরের কাগজটা খুলে থ হয়ে বসেছিলাম। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কখন যে দিয়ে গেছে খেয়াল করিনি। বারবার একই খবর পড়ছি। বিনোদবাবু আর নেই।

বিনোদবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় একটা নামী পত্রিকার অফিসে। ভারী হাসিখুশি স্বভাবের ভদ্রলোক। আমার থেকে বয়সে বছর কুড়ি বড়। কিন্তু প্রথম আলাপেই এত আপনার করে নিয়েছিলেন যে বোঝানো মুস্কিল। আর চেহারাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। চওড়া কপাল, ছোট থুতনি। চোখের নীচটা খানিকটা ফোলা মতন। নাকটা বড়-দৈর্ঘে ও প্রস্থে। ভুঁড়িটা শরীরের বাকি অংশের থেকে আধফুট আগে এগিয়ে থাকে।

ওনার নাম আমি অবশ্য আগেই শুনেছিলাম নামকরা কিশোর-সাহিত্যিক হিসেবে। তবে সামনাসামনি দেখা সেই প্রথম। তারপর থেকে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। লেখা নিয়ে মাঝেমধ্যেই আলোচনা হত। উনি রেডিওতে প্রতি শনিবার 'বিনোদবাবুর আসর' বলে একটা গল্প বলার আসর পরিচালনা করতেন। খুব জনপ্রিয় প্রোগ্রাম। তাতে কখনো ভূত-কখনো জমাটি রহস্যের গল্প থাকত।

এটা বছর দেড়েক আগের ঘটনা। সাধারণত শনিবারে আমি বাড়ি



থাকি না। তাই শোনাও হয় না। সেই শনিবারটা ছিলাম। আড়াইটের সময় রেডিও খুলতেই বিনোদবাবুর পরিচিত গলাটা ভেসে এল।

আজকে আমি যে গল্পটা বলব সেটা আমার নিজের। তবে নিজের লেখা নয়। দেখা।

ছেলেবেলা থেকে তোমাদের জন্য নানা ভূতের গল্প, অলৌকিক গল্প লিখে এসেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এমনই ভাগ্য, কখনই ভূত দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার ভালো লেখার ক্ষমতা দেখেও কোনো অতৃপ্ত আত্মা তাঁর আত্মজীবনী লেখার ভার আমাকে দিয়ে যায়নি। ভূতেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আজীবন লিখে গেছি, অথচ ভূতেরা আমাকে চিরকালই এড়িয়ে এসেছে।

আমার ভূতদের প্রতি এই ভালোবাসার পিছনে ছোটবেলার একটা ঘটনা অনেকটাই দায়ী। আমার ছোটবেলা কেটেছিল উত্তর কলকাতার একটা বাড়িতে। বিশাল বাড়ি। আমার জন্মের বছর পনেরো আগে বাবা এটা কিনেছিলেন। মাঝে বিশাল উঠান। আর তার চারদিক দিয়ে ঘেরা বারান্দা। দোতলা বাড়ি। আমরা দোতলাতেই থাকতাম। একতলার ঘরগুলোতে কেউই থাকত না। দোকানের গুদাম হিসেবে কিছু ঘর ব্যবহার করা হত। বাকি ঘরগুলো প্রায় বারোমাসই বন্ধ থাকত। বন্ধঘরের ভেতর কী আছে সেটা জানার খুব আগ্রহ থাকলেও তালা খুলে ভেতরে ঢোকা অতটা সাহসে কুলোত না। এছাড়া ছিল একটা পাম্পের ঘর। একতলার উত্তর পশ্চিম কোণের এক প্রান্তে। ওই ঘরে ঢোকার দরজাটা অন্য ঘরগুলোর তুলনায় অনেক ছোট। ওপরের দেওয়ালে একটা বড় ফোকর। সেখানে পায়রা এসে বসত। ঘরটার মধ্যে কোন ইলেকট্রিক লাইন ছিল না, আলো জ্বালানোর জন্য।

এই ঘরটাতে প্রায়ই কাউকে না কাউকে আসতে হত। পাম্প চালানো-

বন্ধ করা হত এই ঘর থেকেই। দিনের বেলাও ঘরটা ছিল আবছা অন্ধকারে ঢাকা। বারান্দার ধার করা আলোয় যেটুকু দেখা যেত। ঘরের ভেতর দিকে ছিল একটা চৌবাচ্চা। তার থেকে জল পাম্পের সাহায্যে উপরের ট্যাঙ্কে তোলা হত। একটা তারের জালি দিয়ে চৌবাচ্চাটাকে ঘরের বাকি অংশের থেকে আলাদা করা ছিল।

পারতপক্ষে আমি ওই পাম্প ঘরটায় ঢুকতাম না। কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলাম। ওই ঘরে না ঢোকার জন্য বন্ধুরা ভীতু বলতে শুরু করল। একদিন যখন আমাকে পাম্প চালাতে বলা হল, আমি আর এড়াতে পারলাম না। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরটার ভিতরে পা দিলাম। কোন রকমে একটা পা ঘরের ভেতরে রেখে সুইচের লিভারটা ঘড়াং করে টেনে দিলাম, নীচে থেকে উপরে। বিকট গোঁ গোঁ আওয়াজ করে পাম্পটা চলতে শুরু করল।

এরপর থেকে প্রায়ই যেতাম ওই ঘরে। পাম্প চালু বা বন্ধ করতে। সেদিন সোম কি মঙ্গলবার হবে। স্কুল থেকে সবে ফিরেছি। মায়ের গলা ওপর থেকে পেলাম—'শুভ, পাম্পটা চালিয়ে দে।'

সেদিন কি খেয়াল হল পাম্পটা চালিয়ে মনে হল চৌবাচ্চাটা উঁকি মেরে দেখি। যেখান থেকে পাম্পটা চালাতে হয়, সেখান থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সাত-আট পা এগিয়ে তারের জালিতে চোখ রাখলাম। আস্তে আস্তে চৌবাচ্চাটা চোখে ধরা দিতে শুরু করল। কী একটা যেন ভাসছে চৌবাচ্চায়। যখন বুঝলাম জিনিসটা কী হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেল। চিৎকার করার মতোও অবস্থা নেই। একটা দেহ জলে ভাসছে। পরণে পায়জামা-পাঞ্জাবী। মুখটা ভালো ভাবে বোঝা না গেলেও এটুকু বুঝলাম লোকটা বেশ মোটাসোটা। হুঁশ ফিরতে কোন রকম চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ভয়ে আতঙ্কে তিন-চারটে সিঁড়ি লাফিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। মা তো শুনে ভয়ে অস্থির। মা দিদি আর আমাদের কাজের লোক লক্ষ্মণকে নিয়ে চারজনে দোতলা থেকে এক তলায় নামলাম। তারের জালির ফাঁক দিয়ে ফের তাকিয়ে দেখি কোথায় কী। কিছুই নেই। টর্চের আলোয় চক চক করছে চৌবাচ্চার পরিষ্কার জল। এসব দেখে যা হয় আর কী, দু-চারখানা যা ভূতের বই ছিল সব পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

তবু কিছুটা হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল আমার কথায়। বাবা পুরো চৌবাচ্চা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করলেন। পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা মৃতদেহ উদ্ধার হল। তবে সেটা একটা আরশোলার।

এর পরে বেশ কিছুদিন আমি ভয়ে ও ঘরে যেতাম না। স্পষ্ট দেখেছি ওই মৃত দেহটাকে। কিন্তু কোথায় উবে গেল মৃতদেহটা।

এর প্রায় দুমাস পরে আবার বাধ্য হয়ে ও ঘরে যেতে হল। ঘরের মধ্যে পা রাখতেই কি যেন অজানা আকর্ষণে ফের এগিয়ে গেলাম চৌবাচ্চার দিকে। চোখ রাখলাম তারের জালির গায়ে। অন্ধকারে চোখ খানিকটা সয়ে আসতে শুরু করল। চৌবাচ্চাটা ফের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা মৃতদেহ তবে সেই দিনের সেই লোকটার নয়। কারণ এ লোকটার পরণে শার্ট-প্যান্ট। ডান হাতটা নেই। যেন কাঁধ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। মুখটা তখন খুব চেনা মনে হয়েছিল। এখন বুঝি কেন। চেহারা মুখ অবিকল যেন এখনকার আমার মতো। ডান হাতটা নেই এই যা।

বাইরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। চেঁচালাম না, কাউকে ডাকলাম না। ভয় অবশ্য খুবই পেয়েছিলাম। বাইরে এসে চোখে বারবার জলের ঝাপটা দিলাম। ফের ঢুকলাম, এবার তারের জালির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখি কিছুই নেই। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এলাম। কে জানে হয়তো

মাথার উপরেই দেওয়ালটাতে ঝুলছে মৃতদেহটা বা হয়ত দরজার খাঁজে দাঁড় করানো আছে।

এরপর আমি আর কোনদিন ওই পাম্পের ঘরে যাইনি। এক বছর বাদে আমরা একটা ভালো ফ্ল্যাট পেলাম গড়িয়াহাটের কাছে। আসলে এই বড় বাড়িটা মেরামতি, দেখাশোনার ব্যাপার নানান অসুবিধে হচ্ছিল। বাড়িটা তাই বিক্রির চেষ্টা করা হল। দামও বেশ ভালো পাওয়া গেল। আমরা বাড়ি বিক্রি করে গড়িয়াহাটে চলে এলাম।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। স্কুলের ব্যাগ পিঠ থেকে নেমে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেছি। প্রফেসর হয়েছি। আস্তে আস্তে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

তোমাদের কাছাকাছি বারবার এসেছি পত্র পত্রিকার মাধ্যমে, টিভি, রেডিওর মাধ্যমে। সেদিন কী খেয়াল হল, মনে হল যাই ওই বাড়িতে। ভেতরে ঢুকতে যাব, পাড়ার কিছু ছেলে আমায় ঘিরে ধরল। ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে। একথা-সেকথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলাম। কিছু সংস্কার করা হলেও বাড়িটা মোটামুটি আগের মতই আছে। বাড়ির এখনকার মালিক মারোয়াড়ি। আমার উপন্যাস, 'অশ্বত্থ'র উপর নির্ভর করে যে হিন্দি টিভি সিরিয়ালটা হচ্ছে সেটা উনি নিয়মিত দেখেন। কথায় কথায় খেয়াল হল পাম্পের ঘরটার কথা। ওনাকে ওই ঘরটার কথা জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোকের মুখে চোখে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব ফুটে উঠল। শেষে কারণটা বোঝা গেল, উনিই বললেন। আমরা যাদের কাছে বাড়িটা বিক্রি করি তাদের ছিল বিশাল ব্যবসা। অনেক টাকাও যেমন ছিল ব্যবসার সূত্রে অনেকের সঙ্গে শত্রুতাও ছিল। হঠাৎ একদিন উনি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। দুদিন বাদে পুলিশ এসে ওনার ডেডবডি খুঁজে পায় পাম্পের ঘরে -ওই চৌবাচ্চার মধ্যে। পচে ভেসে উঠেছিল।

'কি পরেছিল'? জিজ্ঞেস করতে যে উত্তরটা পেলাম তাতে তো আমি অবাক। পায়জামা-পাঞ্জাবি। চেহারার যা বর্ণনা পাই-তা আমার দেখা ওই প্রথম লোকটার মতো। যাকে আমি চৌবাচ্চার জলে প্রথমবার ভেসে উঠতে দেখেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে।

এই ঘটনার পরে ওঁরা বাড়িটা বিক্রি করে দেন এই মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের কাছে। আর পাম্পের ঘরটা; চৌবাচ্চাটা চলে যায় আর একটা তালাবন্ধ দরজার পেছনে।

এতটা বলার পর একটুক্ষণ থামলেন। বিনোদবাবু ফের বলে উঠলেন—'জানি না কেন দ্বিতীয়বার ওই চৌবাচ্চাতে আবার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখেছিলাম। তখন তো আর তিরিশ বছর বাদে আমাকে কিরকম দেখতে হবে তা জানতাম না। কিন্তু আজ যখন আয়নার সামনে দাঁড়াই, প্রত্যেকবার, হ্যাঁ-প্রত্যেকবার—আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওই ডানহাত কাটা মৃতদেহের ছবি। যাকে হুবহু আমার মতো দেখতে। তা এবার বলো এটা সত্যি অলৌকিক কিনা।'

রেডিওতে 'বিনোদবাবুর আসর' অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ হয়। আরো বহুবার বিনোদবাবুর আসর শুনেছি। কিন্তু আজ খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে সেদিনের সে গল্পটাই কেন মনে পড়ল, তা ওই খবরের খানিকটা অংশ বললেই বুঝতে পারবে।

"বিখ্যাত সাহিত্যিক বিনোদ সরকার কাল রাতে রহস্যজনকভাবে মারা যান। ওনার উত্তর কলকাতার বাড়ির চৌবাচ্চার মধ্যে ওনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। কয়েকমাস আগে উনি এ বাড়িটা কেনেন। এ বাড়িতেই নাকি ওনার শৈশব কেটেছিল। বিনোদবাবুর ছেলে দীপকবাবু জানান যে বিনোদবাবুকে গতকাল সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিনোদবাবু মাঝেমধ্যেই কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন বলে

বাড়ির লোকজনও প্রথমে খুব একটা চিন্তা করেননি। বাড়ির কাজের লোক পাম্প চালাতে এসে প্রথম ওনার মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখেন। তিন মাস আগে একটা পথ দুর্ঘটনায় ডান হাত কাটা যাওয়ার পর থেকেই বিনোদবাবু মানসিক রোগে ভুগছিলেন। তারই পরিণামে এই আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।”

পিকোরাস

১৫ জুন। সেদিন বোধ হয় মঙ্গলবার ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে দেখি বাড়ির আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে।

যা ভয় করেছি ঠিক তাই। বোন ফেল করেছে। আবার আরেক বছর ক্লাস সিক্স-এ। আত্মীয় স্বজনই বা কি বলবে?

বোনকে অঙ্ক-টঙ্ক আমিই দেখাই। সেদিক থেকে আমারও একটা দায়িত্ব এসে যায়। রেগে গিয়ে জোরে কানমুলে দিলাম। দিয়েই খারাপ লাগল। কি করবে বেচারা? ও-তো চেষ্টার ত্রুটি করেনি। মাথায় না ঢুকলে ওই বা কি করতে পারে?

আমি নিজে কখনো কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইনি। আমাকে বরাবর প্রথম হতে দেখে মা-বাবা বোনের কাছ থেকেও ওরকমই আশা করেন। কিন্তু বোন কোনকালেই সে আশা পূরণ করতে পারে না। কোনরকমে ঘষে ঘষে ক্লাস সিক্সে উঠেছিল। কিন্তু এবার আর পারলো না।

১৬ জুন

ঘটনার শুরু এর পরের দিন থেকে। আমি ইউনিভার্সিটি থেকে সবে ফিরেছি। তা সাতটা - সাড়ে সাতটা হবে। এমন সময় বোন একটা বই নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখে দুঃখের লেশমাত্র নেই। বেশ হাসতে হাসতে বলল,—দাদা, তোর এই পদার্থবিদ্যার বইটা দেখছিলাম। এতে দ্যাখ, লেখা আছে প্রোটন, ইলেকট্রন আর নিউট্রন নাকি পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা।



এদের নাকি আর ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু এদের প্রত্যেকটাকেই আমি জানি আরো ভাঙ্গা যায়।

আমি প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। কারণ বোন সাধারণতঃ যেসব প্রশ্ন করে বা মন্তব্য রাখে, সেগুলোর কোনটাই গুরুত্ব দেওয়ার মতো নয়। যেমন—বেড়ালে মাছ বেশি ভালোবাসে, না মাংস বেশি ভালোবাসে? এরকম নানা অর্থহীন প্রশ্ন।

পরীক্ষায় ফেল করার পর পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু তা বলে এতটা? তাছাড়া বলছে যা সত্যি। কিন্তু ওর তো জানার কথা নয়।

সেদিন আরো কয়েকটা অদ্ভুত কথা ওর মুখে শুনলাম। কিন্তু সত্যি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন ও বলল, বাতাসে দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী বেঞ্জিনের একটা যৌগ।

প্রায় আট নয় অক্ষরের কি একটা যৌগের জটিল নাম উচ্চারণ করে ও সেই যৌগ বাতাস থেকে কমানোর ষোলোটা উপায়ও বলে গেল।

১৭ জুন

বোনের পাগলামি আরো বেড়েছে। কানমলা দেওয়াটা একেবারেই উচিত হয়নি দেখছি। কাল সারারাত ওর ঘর থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

সকালে উঠে ওর ঘরে গিয়ে দেখি বিশাল একটা বেলুন। সেটার গায়ে তুলি দিয়ে একমনে রঙ করে যাচ্ছে। আমি যেতেই বেলুনের ওপর ছোট একটা লাল ফুটকি দেখিয়ে বলল,—এই যে তোমাদের সৌরজগৎ।

তার চারপাশে সবুজ কতকগুলো ফুটকি দেখিয়ে ও বলল,—এগুলো এরকমই আরো কয়েকটা জগৎ। প্রত্যেকটার কেন্দ্রে আছে একটা তারা। যেটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক গ্রহ।

একটার কেন্দ্রে আবার দুটো তারা দেখিয়ে ও বলল, —এ দুটো

রয়েছে একটা উপবৃত্তের দুই ফোকাসে বা নাভিকেন্দ্রে। সব গ্রহ যে তারার কাছ থেকে তাপ নিয়ে উজ্জ্বল্য পেয়েছে তা নয়, কয়েকটার উষ্ণতা এত বেশি যে, গ্রহই তারাদের তাপ বিকিরণ করে।

এই রকম কয়েকটা সৌরজগৎ-কে একসাথে গোল দাগ মেরে ও বলতে থাকে যে ওটাই আমাদের গ্যালাক্সি। একে ঘিরে রয়েছে আরো কয়েকটা গ্যালাক্সি বা তারা মণ্ডল। প্রত্যেকটা তারামণ্ডল অজস্র তারা নিয়ে গঠিত। এদেরই মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ও বেগুনী কালিতে কয়েকটা বিন্দু দেখিয়েছে। জিজ্ঞেস করতে বলল—কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল। কিছু কিছু তারা যাদের ভর খুব বেশি, তারা নাকি আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে ঐরকম ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়। সৌরজগতের অবশ্য সেরকম ভয় নেই। সূর্যের ভরের দেড়গুণের বেশি হলে, সেই তারার জগৎ কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—তা আঁকলিই যখন, তখন বেলুনের ওপর আঁকার কি দরকার? একটা বড় কাগজেই আঁক না।

ও খুব গম্ভীরভাবে বলল যে ও মহাবিশ্ব আঁকছে। যার চেহারা নাকি বেলুনের মতো। আর বেলুন যেভাবে ফোলানো হয়, সেরকম ভাবে মহাবিশ্বও নাকি ফুলে ফেঁপে উঠছে। সেইজন্যে পুরো চেহারাটা আনতে বেলুনের দরকার। একটা বেলুন ফুলতে থাকলে যেমন তার গায়ের নকশাগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে ফুটে ওঠে, সেরকম ভাবেই নাকি খুব ছোট ছোট তারামণ্ডলগুলো বড় হচ্ছে। আর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের পৃথিবীর থেকেও সূর্য ছাড়া অন্য তারাগুলো দূরে দূরে সরে যাচ্ছে।

আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে ও বিরক্ত হয়ে জানালো, ওর আঁকতে অসুবিধে হচ্ছে।

আমার অবশ্য প্রশ্ন করার পেছনে নতুন কিছু জানার ইচ্ছে ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ছিল ওর মাথাটা কতখানি খারাপ হয়েছে, তাই দেখা।

মাকে জানাতে মা ছুটে এসে বোনের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,— আহা ফেল তো কত লোকেই করে। তাতে এত দুঃখের কি আছে? তা আজকে কি খাবি বল? চিংড়ির মালাইকারি, না মাংস?

১৮ জুন

আজ বাবা-ও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। যে বোন দিনরাত টিভি-র সামনে পড়ে থাকে, সেই আজ সেধে গিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করেছে, যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কী?

বাবা 'সুমেরু সভ্যতা' বলতে, ও তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নাকি 'জেরীকো সভ্যতা'।

বাবা ইতিহাসের লোক। স্বাভাবিক ভাবেই মানতে রাজী হননি। কিন্তু বোন নাকি এরপরে প্রায় একঘণ্টা যুক্তির পর যুক্তি, তথ্যের পরে তথ্য দেখিয়ে গেছে।

ওর মতে পৃথিবীতে এর আগেও নাকি একবার ঠিক একইভাবে আদিম সভ্যতা থেকে উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছিল। 'অ্যালমাডা' নামের এই গ্যালাক্সি রই একটা গ্রহপুঞ্জের লোকের পৃথিবী আক্রমণ করে। পৃথিবীতে উপনিবেশ গড়ার চেষ্টা করে ওরা। ওদেরই হাতে তখনকার দিনের পৃথিবীর মানুষদের মৃত্যু ঘটে।

বোনের মতে অবশ্য সেই মানুষগুলোকে দেখতে ছিল একটু অন্যরকম। মাথাটা ছিল শরীরের প্রায় অর্ধেক ভাগ জুড়ে। পা দুটো ছিল খুব ছোটছোট। হাত ছিল চার চারটে। কান দুটো ছিল শরীরের অনেক নীচের দিকে। ফলে এখনকার সরীসৃপ প্রাণীর মতো ওদের শ্রবণশক্তি ছিল দারুণ প্রখর। কৃত্রিম বুদ্ধির গবেষণায় ওরা এত এগিয়ে গিয়েছিল

যে সব কাজের জন্যই ছিল রোবট। পায়ের কম ব্যবহারের জন্যই অভিযোজনের ফলে ওদের পা ছোট হয়ে গিয়েছিল।

খুব বেশি রকমের আত্মতুষ্টিই শেষ পর্যন্ত ওদের কাল হল। রোবটের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা ওদের অলস করে তুলেছিল।

তখন পৃথিবী ছিল অনেক উত্তপ্ত। বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাস ও হিলিয়াম ছিল সবচেয়ে বেশি। অক্সিজেন ছিল না বললেই চলে। তবু এই ধরনের নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই ওরা খুব উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

এ সময়ে অ্যালমাডার লোকেরা পৃথিবীর ওপরে চড়াও হয়। এক বিধ্বংসী পরমাণু যুদ্ধে তখনকার মানুষরা অ্যালমাডাদের কাছে হেরে যায়। পৃথিবীর একটা বড় অংশ ভেঙ্গে গিয়ে অন্য এক কক্ষপথে গিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। সেটাই মঙ্গল। মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও অ্যালমাডাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়নি। পৃথিবীতে পরমাণু যুদ্ধের ফলে তেজস্ক্রিয়তা খুব বেশি হয়ে যাওয়ায়, ওরা পৃথিবী ছাড়তে বাধ্য হয়।

এক নিঃশ্বাসে বোন এই ধরনের আরো নানা কথা শুনিয়েছে বাবাকে।

ওর মতে ভূপৃষ্ঠের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার নীচে গেলে সেদিনকার সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া সম্ভব। ওর মতে কার্বন ডেটিং-এর সাহায্যে প্রমাণ পাওয়া সম্ভব যে জেরীকোর সভ্যতা আজ থেকে প্রায় সাড়ে দশ লাখ বছরের পুরোনো, যেখানে সুমেরীয় সভ্যতা মোটে সাত হাজার বছরের।

বাবা বোনের মুখে এসব কথা শোনার পর খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। চিন্তা অবশ্য জেরীকোর সভ্যতা ছিল কি ছিল না তা নিয়ে নয়, চিন্তা বোনকে নিয়ে। ফোনে বাড়ির ডাক্তার বিষ্টুচরণ মিত্রের সঙ্গে কথা বলে

নিয়েছেন। উনি অবশ্য আরো কয়েকদিন অবজারভেশনে রাখতে বলেছেন বোনকে। তারপরে প্রয়োজন হলে মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে ওকে নিয়ে যেতে হবে।

২০ জুন

বোনের শরীর উত্তরোত্তর আরও খারাপের দিকে। কাল সারারাত ও ছাদে একা একা ঘোরাঘুরি করেছে।

রাত দেড়টা নাগাদ আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ছাদে কার যেন পায়ের শব্দ। ছাদের দরজা খুলে দেখি, বোন ছাদের একপ্রান্তে থেকে অন্যপ্রান্তে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ওর মুখটা কিসের আলোয় যেন চকচক করছে।

আমি ডাকতে কাছে এসে দাঁড়াল ও। মুখটা কেমন যেন ভাবলেশহীন। ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে পাগল-টাগল হয়ে গেল না তো?

ও বোধ হয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছিল। খুব গম্ভীরভাবে বলল,—আট ডিগ্রি অক্ষাংশ আর আশি ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে একটা বিশাল ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে।

আমি সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করি,—কোথায় ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে না আছে, তাতে আমার কি দরকার? চল, শুবি চল।

ও গম্ভীরভাবে বলে চলে,—ভূমিকম্পের মান হবে রিখটার স্কেলে সাতেরও ওপরে। ঠিক সময়ে লোকজনকে সরিয়ে না নিলে হাজার হাজার লোক মারা যাবে।

বিরক্ত হয়ে একাই ছাদ থেকে নেমে আসি। ক'টায় শুতে গিয়েছিল কে জানে। ভোর হতে ওর ঘরে গিয়ে দেখি সেই বেলুনটায় ও রঙ করে চলেছে।

ওকে ভোলাবার জন্য গম্ভীরভাবে বলি,—জানিস তো, পৃথিবী ছাড়া কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীর হদিস পাওয়া যায়নি।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে,—কেন আমি নই?

তারপরে মুচকি হেসে বলে,—আচ্ছা, তুমি হাইড্রোজেন গ্যাস দেখেছ?

আমি বলি,—গ্যাস আবার দেখা যায় নাকি? ধর্ম দেখে বুঝতে হয়।

ও দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বলে,—ঠিক তাই, অধিকাংশ গ্যালাক্সিতেই কোনো না কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে। তবে তাদের সবাইকে যে দেখা যায়, তা নয়। তাদের অনুভব করতে হয়।

—তা বুদ্ধিমানই যদি হবে, তাহলে তারা যোগাযোগ করে না কেন পৃথিবীর সঙ্গে?

—অধিকাংশ জগতেই আলোর থেকে বেশি দ্রুতগামী কোনো কিছু জানা নেই। আর এই গ্যালাক্সিগুলো ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ফলে এক জগৎ থেকে অন্য জগতে সঙ্কেত পাঠাতে যে সময় লাগে, তার মধ্যে হয়ত অন্য জগতে বহু সভ্যতা গড়ে উঠে আবার বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবে কোনো জগৎ যদি আলোর থেকে বহুগুণ গতিবেগ সম্পন্ন কণিকা বের করতে পারে, তবে তারা এই দূরত্বকে খুব সহজে অতিক্রম করতে পারবে।

—সে তো আইনস্টাইনের মতে সম্ভবই নয়।

মুচকি হেসে বোন জানায়, সে-ও নাকি সম্ভব।

সাধে ক্লাসে ফেল করায়। এরকমই কিছু লিখেছিল বোধ হয়।

২১ জুন

সকালের কাগজটা খুলেই চমকে উঠেছি। শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু জায়গা একটা ভয়াবহ ভূমিকম্পে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জায়গাগুলোর অবস্থান বোনের বলা অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশের সাথে মিলে যাচ্ছে।

বোনকে এটা বলতে ও বলল, মহাকাশ থেকে তোলা ছবি থেকে বোঝাই গিয়েছিল ভূমিকম্প হবে। অবশ্য কোন্ মহাকাশযান থেকে তোলা কোন্ ছবি, তা ও বলল না।

বোনের দুঃখ কাটানোর জন্য সেদিন কয়েকটা ক্যাডবেরি নিয়ে এসেছিলাম।

খেতে খেতে হঠাৎ ও একটা উদ্ভট কথা বলে বসল,—দাদা, ধর আমি তোর বোন নই। আমি এখান থেকে কোটি কোটি মাইল দূরের অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। তখন কি হবে?

বলা বাহুল্য সেটা আমার পক্ষে দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার। ক্যাডবেরি ও অন্যান্য নানান খরচ কমে যাবে। তবে সে তো হবার নয়।

মা পাশেই ছিল। রেগে গিয়ে বলে উঠল,—যত্তো সব অলুক্ষুণে কথা।

খানিকক্ষণ বাদে বোনের সঙ্গে ওর ঘরে গেলাম। বেলুনটায় নানা রকম নক্সা এঁকেছে।

পৃথিবীর প্রায় বিপরীত দিকে একটা লাল বিন্দুতে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। ওর কথা মত ওটা নাকি আরেকটা তারা। রেড স্টার। তারার জ্বালানী হাইড্রোজেন প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায়, লাল রঙ হয়ে গেছে। মহাবিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও উন্নত প্রাণীর বাস নাকি ওতে। ওদের বিজ্ঞান এত উন্নত যে ওরাই নাকি ওদের উপযুক্ত জগৎ গড়ে নিতে পারে। ওদের সভ্যতা বেশ কয়েকটা তারা আর তাদের গ্রহদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। ওরা আলোর চেয়ে প্রায় এক লক্ষগুণ গতিবেগ সম্পন্ন যান বের করেছে। মৃত্যুকে জয় করেছে ওরা। চিন্তা খালি একটাই। এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। যে কোনোদিন খুব বেশি ফোলানো

বেলুনের মতোই তা ফেটে পড়তে পারে।

সেই সমস্যার সমাধানে এই মহাবিশ্বের যাবতীয় বুদ্ধিমান প্রাণীকে একত্র করতে ওরা বেরিয়ে পড়েছে এক গ্যালাক্সি থেকে আর এক গ্যালাক্সিতে।

পৃথিবীর মানুষকে ওরা অবশ্য বুদ্ধিমান জীব বলে গণ্য করে না। যে জীব পৃথিবীর বাইরের কিছুই প্রায় জানে না, অথচ নানাভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে ব্যস্ত, তাদের বুদ্ধিহীন ছাড়া কী-ই বা বলা যায়!

এরকম আরো হয়তো অনেক কথা বলত, হঠাৎ কি কারণে জানি না, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বোন।

ওকে অনুসরণ করে ছাদে গিয়ে দেখি আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। আমাকে দেখে খানিকক্ষণ বাদে বলল,—দাদা, পৃথিবীর বড় বিপদ। প্রস্টি নামের একটা ধূমকেতু তার নিয়মিত পথ থেকে সরে গিয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। বেগ সেকেণ্ডে কুড়ি লক্ষ মাইলের মতো। আজ রাত চারটে বেজে চার মিনিটে পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষ হবে।

—-ছাড় তো আজেবাজে কথা। সেরকম যদি হয় তো তাহলে নাসা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বহু আগেই নানা রকম ব্যবস্থা নিত। আর তুই বা এটা জানলি কি করে?

—সে আমি বলব না। তবে আমি যা বলছি, তা একদম ঠিক। প্রস্টি ধূমকেতু সাধারণতঃ সৌরজগতে প্রবেশ করে না। এবারই হঠাৎ করে একটা বিস্ফোরণের ফলে এরকমভাবে বেঁকে গেছে।

বোনের কথাগুলো এবার আর আগের বারের মতো অবিশ্বাস করছিলাম না। কেন জানি মনে হচ্ছিল, বোনের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি কাজ করছে।

ছাদ থেকে নেমে ঘরে ঢুকলাম। সোফায় বসলাম।

বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কি জানি কি হবে! এত বড় পৃথিবীটা খোলামকুচির মত ভেঙ্গে যাবে?

রাত দুটোর সময় হঠাৎ আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখি বোন। একগাল হেসে বলল,—আর ভয় নেই। ধূমকেতুকে তার লক্ষ্যপথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। ওর মধ্যেই ঐ বিশাল ধূমকেতুটা চিরসমাধি পাবে।

—কে ঘোরাল ধূমকেতুটা?

—ওই যে তোমাকে বলেছিলাম, মহাবিশ্বের উন্নততম একটা সভ্যতার কথা। পিকোরাস বলে ওরা পরিচিত। ওরাই উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ধূমকেতুর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে।

—তা তুই জানলি কি করে?

—আমিও তো সেরকমই একজন। তোমার বোনের ব্রেনের নিয়ন্ত্রণ শুধু আমি নিয়ে নিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য। অবশ্য উদ্দেশ্য খারাপ কিছু নয়। বিভিন্ন গ্যালাক্সির মধ্যে সংস্কৃতির আদানপ্রদান। একটু সামাজিক ব্যবস্থা বোঝা। আমার কাজ আপাতত শেষ। আমি আজই চলে যাচ্ছি। তবে যাওয়ার আগে মনে হচ্ছে ঠিক দাদাকেই ছেড়ে যাচ্ছি।

২২ জুন

ঘুম ভাঙ্গল সওয়া সাতটায় মার ডাকে। ছাদ থেকে এসে সোফায় বসার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাকিটা স্বপ্ন। উঃ, কি ভয়ঙ্কর!

ঘুম ভাঙ্গতেই ছুটলাম বোনের ঘরের দিকে। না, বোন দিব্যি ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রঙ করা বেলুনটা এরমধ্যে ফাটানোও হয়ে গেছে। গতকালের ধূমকেতুর কথাটা বলতে আকাশ থেকে পড়ল,—ধূমকেতু কি রে দাদা?

আরো কয়েকটা কথার পর বুঝলাম গত ছ'সাত দিনের কোন কথাই ওর মনে নেই। আমাকে উল্টে জিজ্ঞেস করল,—এ্যাই, আজকে সকালে টিভিতে একটা সিনেমা ছিল না? খোল না টিভিটা।

কিন্তু সিনেমা তো হচ্ছে না। বিশেষ একটা খবর হচ্ছে—

ভয়েজার- কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে গতকাল শেষ রাতে এক অভাবনীয় খবর আসে নাসা মহাকাশকেন্দ্রে। একটা বিশাল ধূমকেতু অত্যন্ত দ্রুত বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। সংঘর্ষে একটা বিশাল বিস্ফোরণ হবে। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত ছবি বিশেষ আলোড়ন তুলেছে। হাভেল স্পেস টেলিস্কোপেও এটা আগে ধরা পড়েনি।

খবরটাতে পাড়া প্রতিবেশী সবার মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। আমি কিন্তু জানি, আমার পিকোরাসবাসী মহাকাশচারী বোনের শেষ কথা মিথ্যে হতে পারে না। সুতরাং ভয়ের আর কিছু নেই।

মাছেরাও যখন

বেশ খানিকক্ষণ ধরেই আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছিল লোকটা। আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হাতের বইয়ে। তবু ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে দিচ্ছিল যে, লোকটা আমাকে দেখছে।

একটু পরে বুঝলাম লোকটা ঠিক আমাকে দেখছে না, ওর দৃষ্টি আমার হাতের বইটার ওপর। একবার মাথা তুলে লোকটাকে ভালো করে দেখে নিলাম। বয়স মনে হল ষাটের কাছাকাছি। হালকা নীল রঙের সার্টের ওপর বেশ শৌখিন একটা টাই পরেছে। চোখে পড়ার মতো একটা চওড়া গোঁফ। এ ধরনের গোঁফওয়ালা লোক ইংল্যান্ডে প্রায় দেখাই যায় না। আর তার সঙ্গে বেশ মানানসই চাপদাড়ি। টিকোল নাকের ওপর বেশ সুন্দর সোনালি ফ্রেমের চশমা। চশমার আড়ালে থাকলেও বোঝা যাচ্ছে চোখদুটো বেশ উজ্জ্বল। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে বেশ কিছু পাকা চুল জেগে আছে। সবমিলিয়ে বেশ সুন্দর দেখতে। নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডের লোক নয়। ইটালিয়ান হওয়ারই সম্ভাবনা। এরকম শার্প ফিচার ওদের মধ্যেই দেখা যায়।

গবেষণা থামিয়ে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। অক্সফোর্ড সার্কাস স্টেশন আসছে। লন্ডন মেট্রো নেটওয়ার্কের সবথেকে ব্যস্ত স্টেশন।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসকালেটর ধরেছি, পিছন থেকে হঠাৎ শুনি

কে বলছে,—বুদ্ধিমান জীব খুঁজতে মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার দরকার নেই, নিজের গ্রহেই আগে খুঁজতে হবে।

হঠাৎ এরকম কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আমার পেছনে এসকালেটারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ট্রেনের ওই ভদ্রলোক। আমি যে-বইটা পড়ছিলাম তার নাম 'সার্চ ফর ইনটেলিজেন্স অন মার্স'। বুঝলাম উনি ওই প্রসঙ্গেই বলছেন। লম্বা এসকালেটর। দশতলা বাড়ির সমান উচ্চতায় উঠছে। লন্ডনের চারটে লেভেলের মেট্রোর মধ্যে পিকাডেলিটি লাইনটাই সব থেকে নিচে। তাই এই এসকালেটারটা এত লম্বা। ভদ্রলোক আরও অনেকক্ষণ কথা বলার সুযোগ পাবেন।

কথা না বলাটা অভদ্রতা ভেবে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে উঠলাম,—বুদ্ধিমান জীব তো পৃথিবীতে আছেই। সব প্রাণীরই বুদ্ধি আছে। কম বা বেশি। তাদেরকে নিয়ে যা জানার ছিল সবই জানা হয়ে গেছে। তাই তো এখন মঙ্গলে সন্ধান শুরু হয়েছে।

ভদ্রলোক কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তার কারণ দুটো আফ্রিকান ছেলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে অভদ্রের মতো ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে ওপরে উঠে গেল। তাল ফিরে পেতে-পেতে আমরা প্রায় ওপরে চলে এসেছি।

মেট্রোর গেট থেকে বেরিয়ে দেখি প্রফেসার জন পেচি দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রোবায়োলজি পড়ান। আমাকেও পড়িয়েছেন। হাত নাড়ছেন। আমিও হাত নাড়লাম। তারপরেই বুঝলাম হাতনাড়াটা আমার উদ্দেশ্যে নয়, সেই ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে। আমাকে মৃদু সম্ভাষণ করে জন ওনার দিকে এগিয়ে গেলেন।

—কি দিমেত্রি, আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

—না, না, কোনও অসুবিধে হয়নি। আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে

বলে ওঠেন,—আমার আরও ভালো লাগে যখন দেখি মেট্রোতে কেউ আমার বই পড়তে-পড়তে আসছে।

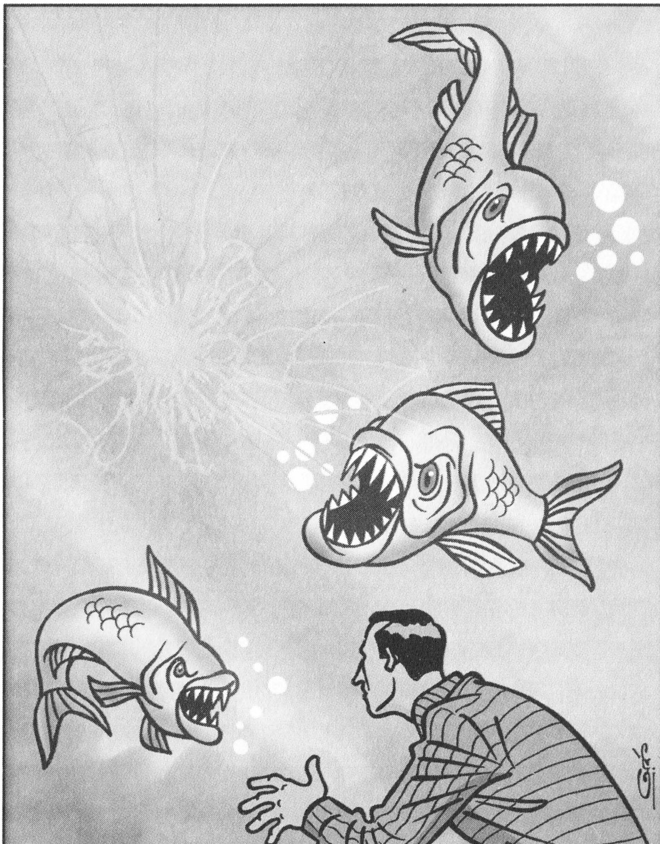
বুঝলাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন দিমেত্রি। হ্যাঁ, তাই তো! বইটার লেখক তো দিমেত্রি নামেরই কেউ। তাহলে ইনিই?

জন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—অনিলিখা, ইনি হলেন ডঃ কাপ্রেতো দিমেত্রি। জীববিজ্ঞানের ও মহাকাশবিজ্ঞানের জগতে দিমেত্রি খুব পরিচিত নাম। তবে ইদানীং আমার বন্ধুর তারকা জগতের ওপর বৈরাগ্য হয়েছে। উনি এতদিনে পৃথিবীর দিকে একটু তাকিয়েছেন।

বলে জন দিমেত্রির হাত ধরে খুব হাসতে লাগলেন।

দিমেত্রি কুড়ি বছর ইংল্যান্ডে আছেন। লিয়নের কাছে একটা ছোট গ্রামে বর্তমানে থাকেন। সবসময় গবেষণার কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে এতদিন লন্ডনে আসতেও সময় পাননি। একটা সায়েন্স কনফারেন্সকে উদ্দেশ্য করে বর্তমানে আসা। মোবাইল ফোন কেনার জন্য ওনারা একটা দোকানে ঢুকলেন। আমি এইচ. এম. ভি.-র শোরুমে ঢুকলাম। তারপরে আর সেদিন দেখা হয়নি। এই হল দিমেত্রির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎ নিতান্ত আকস্মিক। এম সেভেন মোটরওয়ে দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ গাড়ি খারাপ। খানিক আগে থেকেই গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে যাওয়ার সঙ্কেত পাচ্ছিলাম। তবে হঠাৎ যে একেবারেই জবাব দিয়ে বসবে তা বুঝতে পারিনি। রাস্তার পাশের শোল্ডারে রেখে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনকে ফোন করছি, হঠাৎ একটা গাড়ি সামনের রাস্তা থেকে সরে এসে সামনে শোল্ডারে দাঁড়াল। কে হতে পারে ভাবছি, এর মধ্যেই গাড়ি থেকে প্রফেসার দিমেত্রি নেমে এলেন। উনি অবশ্য আমাকে খেয়াল করে দাঁড়াননি, এমনিতেই সাহায্য করতে



দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখে প্রথমে চিনতেও পারেন নি। তারপরে আমি মনে করে দেওয়াতে ভারি খুশি হলেন। ওনার গাড়িতে খানিকটা জল ছিল। কিন্তু রেডিয়েটারে জল ঢেলেও গাড়িকে শান্ত করা গেল না। কিছুতেই স্টার্ট হল না। অগত্যা ঠিক হল, ওখানেই গাড়ি রেখে প্রফেসারের গাড়ি করে ওনার বাড়িতে চলে যাব। রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরের দিন যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

লিয়ন একটা ছোট গ্রাম। বড়জোড় খান পঞ্চাশেক পরিবারের বাস। আর আছে একটা স্কুল, দুটো চার্চ। দুটো বড় হাসপাতাল, পোস্টঅফিস, ব্যাঙ্ক আর ছোটখাটো কিছু দোকান-রেস্তোরাঁ। প্রফেসারের বাড়িটা গ্রামের একপ্রান্তে, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। সামনে বাগান। বাগানের মাঝ বরাবর রাস্তা। রাস্তার শেষে একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। বাগানের পিছনদিকে ঝাউগাছ ঘেরা বেশ বড়সড় একটা পুকুর। আর তার পেছনেই ঘাসে ঢাকা ছোট ছোট টিলা। দূর থেকে মনে হয় যেন সবুজ কার্পেট-মোড়া।

পুকুরের ধারে সিমেন্ট বাঁধানো বেশ খানিকটা চাতাল। তারই ওপরে খোলা আকাশের নিচে টেবিল পেতে বসে নৈশাহার করতে করতে হঠাৎ প্রফেসার বলে উঠলেন,—মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, তা একটু-একটু মনে পড়ে। যাট লক্ষ বছরেরও আগে ছিল র‍্যামাপিথেকাস। তাদের দেখতে ছিল বাঁদর আর শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি। তাদের চোয়ালের গঠন ছিল অনেকটা আমাদেরই মতো, বাঁদরদের মতো নয়। তারপরে এল অস্ট্রেলোপিথেকাস আফ্রিকানাস। প্রায় চল্লিশ লক্ষ বছর আগে তাদের জায়গা নিল অস্ট্রেলোপিথেকাস রোবাস্টাস। মানুষের নিকটতম পূর্বসূরী হল হোমোহ্যাবিলিস। আফ্রিকার একটা লেকের ধারে এদের ফসিল পাওয়া গেছে। এরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল। দলবদ্ধ

ভাবে শিকারে যেত। তবে এরা আগুনের ব্যবহার জানত না।

—ব্যস, ব্যস। দিমেত্রি আমাকে থামিয়ে বলে উঠলেন,—তোমার তো বেশ ভালোই নলেজ আছে। দেখো, প্রায় একশো লক্ষ বছর ধরে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে। আস্তে-আস্তে সে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখেছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে শিখেছে। পাথর কেটে অস্ত্র তৈরি করেছে। আগুন তৈরি করতে শিখেছে। কিন্তু ভেবে দেখো, মানুষ যা কিছু করেছে, যা কিছু শিখেছে তা কিন্তু প্রায় সবটাই গত ছয় হাজার বছরে। যবে থেকে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে, সত্যিকারের অগ্রগতি শুরু হয়েছে তবে থেকেই। কচ্ছপের মতো এগোচ্ছিল, তারপর হঠাৎ রকেটের স্পিডে। বুম্।

স্যালমনের স্যান্ডউইচ খেতে-খেতে হঠাৎ করে প্রফেসার কেন এসব বিষয়ে আলোচনা করছিলেন তা বুঝতে পারছিলাম না। প্রফেসার বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই শেরির গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ফের শুরু করলেন,—তুমি হয়তো ভাবছ আমি কেন এসব বলছি? ওই যে সামনে পুকুরটা দেখছ, এটা বছর দশেক আগে আমি তৈরি করেছিলাম। নানান ধরনের মাছ এনে ছাড়তাম পুকুরটাতে। আমরা কেউই এ-পুকুরের মাছ ধরে খাই না। ধরি, আবার জলে ছেড়ে দিই। মাছ ধরাটা নেশার মতো। ওদের নিয়ে আমি কিছু পরীক্ষা করি, তারপরে আবার জলে ছেড়ে দিই। আমার পুকুরটা এর মধ্যেই মাছে ভরে গেছে। মাটির তলায় পুকুরের ধারে অনেক খরচ করে একটা অবসারভেটরি তৈরি করেছি। কাঁচের ঘরের মধ্যে থেকে পুকুরের নিচটা দারুণ দেখা যায়। রাতে অনেক সময়েই ওখানে গিয়ে বসে থাকি—উদ্দেশ্যই একটাই।

—কী উদ্দেশ্য? —হেসে বলে উঠলাম।

প্রফেসার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপরে বলে উঠলেন,—

মাছেদের চরিত্র বোঝা ও তাতে পরিবর্তন আনা। এরা কীভাবে ভাব আদানপ্রদান করে তা দেখা। প্রথমে পাঁচ বছর আমার এসব নিরীক্ষণ করেই কেটে যায়। তারপরে আমি এদেরকে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করি। তা সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও চলছে।

—কী ধরনের পরীক্ষা?

—আমি মানুষের জিন আর মাছের জিনের ক্রমবিকাশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছি। দেখছি কী পার্থক্য। ক্রেমোজোমের গঠন অনেকটাই এক। তাহলে আমাদের মধ্যে কী আছে যা ওদের মধ্যে নেই। যার জন্য আমরা পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান জীব। সেই পরিবর্তনটা যদি ওদের মধ্যে আনা যায়, তাহলে কী ওরা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না?

প্রফেসার এবার আমাকে ওনার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। নানান ধরনের সরঞ্জাম। জেনেটিক রিসার্চের জন্য সবরকম প্রস্তুতি আছে এই রোবোটিক ল্যাবরেটরিতে।

কথায়-কথায় প্রফেসার বলে উঠলেন,—তোমার কতদিন ইংল্যান্ডে থাকার প্ল্যান?

—আর এক বছরের মধ্যেই দেশে ফিরে যাব। দেশে বুড়ো বাবা-মা আছেন। তাদের পক্ষে তো আর এখানে এসে থাকা সম্ভব নয়। আর ভারতে এখনও সামাজিক পারিবারিক বন্ধনটা এত দৃঢ় যে আমরা আলাদা থাকার কথা ভাবতেও পারি না।

হঠাৎ করে প্রফেসার যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে বলে উঠলেন,—ঠিকই, মানব সভ্যতার শুরু তো এই সামাজিক বন্ধন থেকেই। হয়তো এইজন্যই মানুষ আজ অন্যদের থেকে আলাদা—পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান জীব।

সেদিন সারারাতই প্রায় এসব নিয়ে আলোচনায় কাটল। এখানে

প্রফেসারের সঙ্গী বলতে একজনই। টনি হজেটস। প্রফেসারের আন্ডারে রিসার্চ করছে। সে-ও মাঝে-মাঝে বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে গেল।

সকাল হতে-না-হতে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন লোক আমার গাড়িটা হাইওয়ে থেকে তুলে এনে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। তার ঘণ্টাখানেক বাদে প্রফেসারকে তাঁর উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এর প্রায় দেড় বছর পরের কথা। আমি তখন কর্মসূত্রে আমেরিকার বস্টনে। নিউইয়র্ক টাইমসের তৃতীয় পাতার একটা খবরে হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরে মাছের সংখ্যা হঠাৎ করে কমে গেছে। স্যালমন, ক্যাট, হোয়াইট ও আরও অন্যান্য মাছের উৎপাদন প্রায় আশি শতাংশ কমে গেছে। বছরে ঋতু অনুযায়ী অনেকসময় অথবা হঠাৎ করে কোনও বছরে মাছের উৎপাদন যে আগে কমেনি তা নয়, তবে এভাবে এতটা কমে যাওয়া, বিশেষজ্ঞদের মতে অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

এরপর থেকে এখবরটা আরও ফলাও করে অন্যান্য কাগজে বেরোতে লাগল। আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের নানান জায়গায় জেলেদের জীবিকা কীভাবে বিপন্ন হতে চলেছে কাগজে-কাগজে তার আলোচনা। আবার কোনও কাগজে গ্লোবাল-ওয়ার্মিংকে মাছেদের এই হঠাৎ করে উধাও হওয়ার কারণ হিসাবে দেখানো রয়েছে।

এইরকম নানান ধরনের লেখালেখির মধ্যে হঠাৎ একদিন এক চাঞ্চল্যকর খবর। অবশ্য খবরটা মাছেদের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নয়, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে।

নর্দার্নটন ওয়েলসের একটা ছোট গ্রাম। সমুদ্রের ধারে। জেলেদের গ্রাম। গ্রাম পঞ্চাশ ঘর জেলে আছে। এ জায়গাটা এতই প্রত্যন্ত যে পাহাড়,

উপত্যকা, সমুদ্র সব একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ট্যুরিস্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

১৯ এপ্রিল ভোরের দিকে নর্দার্নটন থেকে কে বা কারা পাশের গ্রামের পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করে। ফোনে কিছু বলে ওঠার আগেই লাইন কেটে যায়। ওখানকার পুলিশ যথেষ্ট তৎপর। এক ঘণ্টার মধ্যে নর্দার্নটন পৌঁছে যায়। পৌঁছেই যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তা বর্ণনা করা তাদের পক্ষেও প্রাথমিকভাবে সম্ভব হয়নি। গ্রামে একজনও বেঁচে নেই। বুড়োবুড়ি থেকে শুরু করে এক মাসের বাচ্চা কারোরই রেহাই মেলনি। কারও চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে তো কারও দেহে হাড় ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই।

পুরো ব্যাপারটাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দেখছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে মৃত্যুর কারণ তারা বলতে চাইছে না। তবে এটুকু তারা বলছে যে গ্রামের সব বাড়িতেই মাছের উগ্র গন্ধ পাওয়া গেছে। যদিও তা হয়তো এ ধরনের জেলেদের বাড়িতে অস্বাভাবিক নয়।

তার ঠিক বারোদিন পর। প্রশান্ত মহাসাগরে। এবার মাছ ধরার জাহাজে। জাপানের বন্দর শহর আবাসিক থেকে কিছুটা দূরে একট মাছ ধরার জাহাজ খুব বিপজ্জনকভাবে চলছিল। প্রায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে যাচ্ছে দেখে জাপানের তটভূমি রক্ষকেরা ওই জাহাজটারপিছু নেয়। জাহাজের দিক থেকে কেউ যোগাযোগ করছে না দেখে তারা অবশেষে জাহাজে উঠতে বাধ্য হয়। উঠে দেখে জাহাজের প্রত্যেকটি লোক মৃত। কিন্তু কারও গায়ে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই।

জাহাজটা সমুদ্রে মাছ ধরে দু-দিন বাদে ফিরছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ওদের খাবারে কোনও বিষক্রিয়া হয়েছিল, যা খাওয়ার পরে জাহাজের সবাই অচৈতন্য হয়ে পড়ে ও পরে মারা যায়। পুরো ঘটনাটাই খাওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যে হয়েছে এ-প্রমাণ প্রাথমিকভাবে পাওয়া গেছে। ওদের খাওয়ার মেনুতে ছিল 'টাকো সু'। 'টাকো সু' হল ভিনিগারে

ভেজানো অক্টোপাস ও শশা।

এর একমাসের মধ্যে ঘটল আরেক আজব ঘটনা। এবার অবশ্য মৃত্যু সংক্রান্ত নয়। সমুদ্রপথে ফ্রান্স থেকে ডেনমার্ক যাচ্ছিল এক তৈলবাহী ট্যাঙ্কার। কড়া নিরাপত্তায়। এ ধরনের জাহাজ ডুবলে সমুদ্রের বিশাল অংশ জুড়ে জলদূষণের ঘটনা ঘটে। অতীতে একরকম ঘটনায় বহু সামুদ্রিক জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই যখনই এরকম জাহাজ চলাচলের কথা হয়, পরিবেশবাদীরা বিক্ষোভে মেতে ওঠে। তাই যতটা সম্ভব গোপনীয়ভাবে এ ধরনের জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবু বিপত্তি ঘটে। যেমন এক্ষেত্রে ঘটেছিল। কীভাবে যেন অন্য একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। জাহাজে থাকা অপরিশোধিত তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

জাহাজের সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও ডুবন্ত জাহাজ থেকে তেল ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তেল যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, তাতে প্রায় চারশো কিলোমিটার জুড়ে যাবতীয় সামুদ্রিক জীবের প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল তীব্র।

কীভাবে ওই তেল ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা যায় তা নিয়ে যখন নানান দেশের মধ্যে ফাইল চালাচালি হচ্ছে, তখনই আশ্চর্য খবরটা পাওয়া গেল। তেল সমুদ্রের জলে আর ছড়াচ্ছে না! কী ব্যাপার? দেখা গেল কে বা কারা ওই তেলের ঘনত্ব পরিবর্তন করে দিয়েছে। তেলের কম্পোজিশনও বদলে গেছে। তেল জলে ভেসে দূরে ছড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে থিতিয়ে পড়ছে সমুদ্রের গভীরে। ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকছে ছোট একটা এলাকায়। তেলের গঠনে এই পরিবর্তন কীভাবে এল তা বিজ্ঞানীমহল বুঝতে পারছে না।

আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল এ-সবের পিছনে আছে একটাই

কমন ফ্যাক্টর—মাছ। আর মাছের কথা মনে হতেই মনে পড়ল প্রফেসার দিমেত্রির কথা। কর্মসূত্রে আমার ম্যানচেস্টার যাওয়ার কথা ছিল। ভাবলাম এক ফাঁকে লিয়নও ঘুরে আসব। এ-ব্যাপারে প্রফেসারের মতামত জানা যাবে। পরিকল্পনা মতো ঠিক পনেরো দিন বাদে লিয়ন পৌঁছলাম।

প্রফেসারের বাড়ি খুঁজে পেতে কিছুটা অসুবিধে হল। বাড়ির চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। চারদিক উঁচু পাঁচিল ঘেরা। গেটের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়ানোর পরে রিমোটচালিত গেট খুলে গেল। একজন বছর চল্লিশের মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মার্থা। এনাকে আগের বারও দেখেছি। বাড়ির সব দেখাশোনা করেন। মার্থার সঙ্গে-সঙ্গে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। বেশ খানিকক্ষণ পরে প্রফেসার নেমে এলেন। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে। বয়স যেন একলাফে কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। আস্তে-আস্তে হেঁটে আমার সামনে এসে বললেন। মুখের আধপোড়া চুরুটটাকে অ্যাসট্রেতে রেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

—কেমন আছ অনিলিখা?

—আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু আপনার এ কী অবস্থা! চেনাই যাচ্ছে না। কোনও অসুখ হয়েছে না কি?

—তা বলতে পার। তবে সেটা কী অসুখ, তা আমি জানি না। দু-মাস হল টনিও মারা গেছে। জানি না ওরা আর ক'দিন আমাকে বাঁচতে দেবে।

—কারা প্রফেসার?

—ওই, ওই—যে শয়তানগুলো। প্রফেসারের চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠল। হাতের আঙুল পুকুরের দিকে নির্দেশ করা।

—মাছ?

—হ্যাঁ, কী ভুলই না করেছিলাম মাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করে। তুমি যখন আগের বার এলে তখন তোমার কথা শুনে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে। আমাদের সভ্যতার শুরু সামাজিক বন্ধন থেকে। এই সামাজিক বন্ধনই আমাদেরকে অনন্য করে তুলেছে। একসঙ্গে থাকার জন্যই আমরা দ্রুত শিখতে পেরেছি, আমাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। এই সামাজিক বন্ধন আমাদের জিনেই আছে। আমি সেই জিন চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। ওই জিন আমি মাছের শরীরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা শুরু করি। কেন যে করেছিলাম। হা ঈশ্বর! প্রফেসার মাথায় হাত দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করেন।

—আজ আমি শুধু যে নিজেকেই বিপদে ফেলেছি তা নয়, আমি সমস্ত মানবজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছি।

—তার মানে, নর্দার্নটনের ঘটনা, আবাসিক-এর জাহাজের ঘটনা—এগুলো কি এর সঙ্গে যুক্ত?

—হ্যাঁ, শুধু তাই নয় অনিলিখা! এ পর্যন্ত প্রায় কুড়িটা ঘটনায় ওদের যুক্ত থাকার প্রমাণ আমি পেয়েছি। যদিও তা সবার কাছে বোধগম্য হয়নি। ওরা আজ একজোট। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এখন একে অপরের কথা বুঝছে। একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করছে। এরা জানে কোন মাছের শক্তি কোথায়। দেখতে-দেখতে এরা একজন আরেকজনের কৌশল আয়ত্ব করছে। উভচর হয়ে উঠছে। গত এক বছরেই ওদের বুদ্ধি ও শক্তি অসম্ভব বেড়ে গেছে। এত দ্রুত সবকিছু শিখে নিচ্ছে যে মনে হয় কয়েক বছরের মধ্যে ওরা মানুষকেও পিছনে ফেলে দেবে। আর ওদের সংখ্যাটা ভাবো, মানুষের সংখ্যার কয়েক লক্ষগুণ।

—তা এসবের শুরু কী এখানেই?

কথা না বলে প্রফেসার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন,—আমার এই

পুকুরটা কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ওরাই পথ করে দিয়েছে। পাশের নথার নদীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পথ। তা দিয়েই এরা যায় আসে। আমি প্রথমে বুঝিনি। একদিন হঠাৎ আমার মনে হল যে, যা মাছ দেখি তারা রোজ পালটে যাচ্ছে। সংখ্যায়, প্রজাতিতে। নজর রাখলাম। মনিটারিং-এর জন্য চিপ ঢুকিয়ে দিলাম মাছের শরীরে। দেখলাম আমার পুকুর থেকে মাছেরা চলে যাচ্ছে নথার নদীতে। আর তার বদলে আসছে নতুন মাছ।

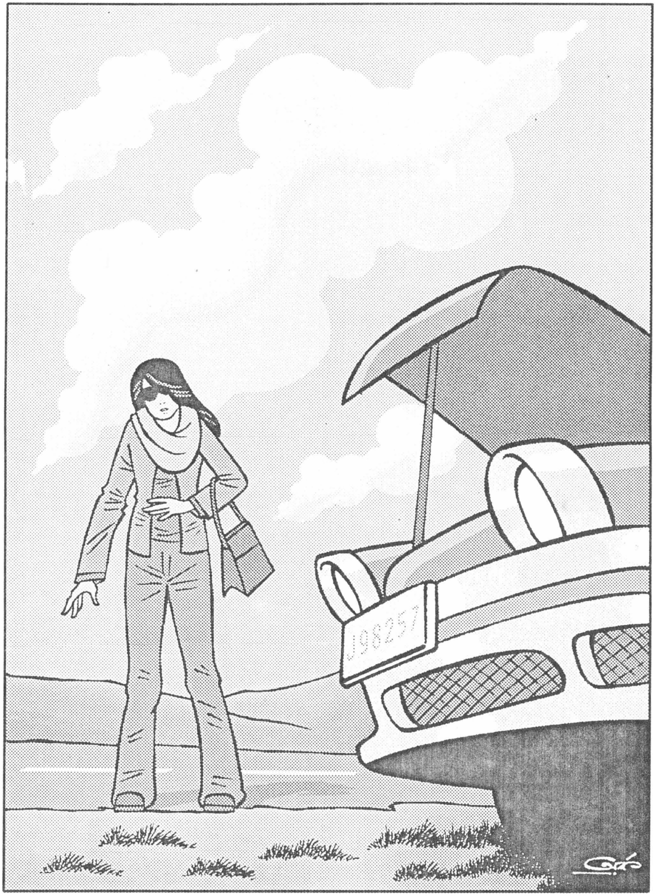
পথটা বন্ধ করে দিতে গেলাম। ওরা শোধ নিল। অবজারভেটরি ভেঙে ওরা টনিকে আক্রমণ করল। মেরে ফেলল। আমি কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচি। এখন আমার পুকুরের ওরাই আসল মালিক। পুকুর কি? পুরো এই এলাকার।

—তা এখন উপায়? সারা বিশ্বে যদি মাছগুলো ছড়িয়ে পড়ে?

—সারা বিশ্বে নয়। সারা মহাবিশ্ব বলো অনিলিখা। এতদিন ধরে মানুষ যা করতে চেষ্টা করেছে, এখন এরাও তাই করবে। এরা চেষ্টা করবে পৃথিবী থেকে ছড়িয়ে পড়তে অন্য গ্রহে, যেখানে ওদের বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ আছে। আর শিগ্‌গিরই একদিন আসবে, যেদিন এ-গ্রহে আমাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ হবে মাছ। যাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমাদের টিকে থাকতে হবে।

প্রফেসার ওঁর ক্লান্ত শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে ফের আর্তনাদ করে ওঠেন,—সেদিনটা দেখার জন্য আমি যেন বেঁচে না থাকি।

মাছেরাও যখন



অতিথি

ডোরবেলটা বেজে উঠল। পরপর দু'বার। কে না জানে দরজা খোলা বারণ। তাই দীপু দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

উত্তর এল না। বেলটা আবার বেজে উঠল। আবার চেঁচিয়ে উঠল দীপু, "আমি একা আছি, বাবা-মা বাড়িতে নেই। নাম না বললে খুলব না। কে?"

উত্তর নেই। নাহ্, এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি দীপুর। উলটো দিক থেকে সাড়া তো আসেই। আচ্ছা, ঋক মজা করছে না তো? চেয়ার টেনে তার উপর উঠে আইহোলে চোখ রাখল দীপু।

পরিষ্কার বোঝা না গেলেও দরজার বাইরে আধো অন্ধকারে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর যে বেশ বয়স হয়েছে তা বুঝতে সময় লাগল না দীপুর। ধুতি পরা। নাহ্, ডাকাত অন্তত নয়। ডাকাতরা কি আর বুড়ো হয়?

তবু ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটা হাতে নিয়ে দরজা খুলল ও। বাবা বলেন, সাবধানের মার নেই। ডাকাত হলে র‍্যাকেটটা দিয়ে ধাঁই করে এক মারে কাত করে ফেলবে দীপু। নাহ্, সেরকম কিছু করতে হল না। লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে দীপুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "এটাও না।"



"কী না দাদু?" ফস করে দাদুই বলে বসল দীপু।

"নাহ্, এটাও আমার ফ্ল্যাট নয়। এখানেই কোথাও..." বলে মাথা নীচু করে দু'দিকে দু'বার নাড়লেন লোকটি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে-আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

অদ্ভুত তো! নিজের বাড়ি কোথায় জানেন না? দীপুর কেন জানি বেশ কষ্ট হল। ওরও একবার এরকম হয়েছিল গতবার পুজোতে ঠাকুর দেখতে গিয়ে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আধঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরেছিল। তারপর ওকে কাঁদতে দেখে একজন এগিয়ে আসে। মাইকে অনেক অ্যানাউন্সমেন্ট করার পর দশমিনিট বাদে বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়া গেল। তখন দীপুর কী রাগ। আরও বেশ খানিকক্ষণ কেঁদেছিল ও।

'ও দাদু, ও দাদু!" আবার চেঁচিয়ে ওঠে দীপু।

লোকটি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘুরে তাকালেন দীপুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে এলেন।

'আমাকে ডাকছিলে, খোকা?'

"হ্যাঁ, দাদু! তুমি ভিতরে এসে বোসো। তা হলেই তোমার বাড়ির কথা মনে পড়ে যাবে।"

লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবলেন কে জানে। তারপর চটি পরেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দীপু প্রায়ই এটা করে, আর তার জন্য বকাও খায়। দাদু ধীর পায়ে হেঁটে এসে সোফায় বেশ আরাম করে বসে পড়লেন। এতক্ষণে চেহারাটা ভাল করে খেয়াল করল দীপু। রোগা, ক্ষয়াটে। চোখে একটা বড় কালো ডাঁটির চশমা। মুখে-চোখে কেমন যেন উদাস ভাব। গালভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখও ভাল করে ধোয়া নয়। মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কিছু খাননি।

ঠিকই ধরেছে দীপু। দাদুর নির্ঘাত খুব খিদেই পেয়েছে। তা না হলে

কিছু না বলে সামনের টেবিলে রাখা দীপুর আধখাওয়া কলাটা ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে খেতে শুরু করেন। দিপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একমনে কলাটা শেষ করে দাদু আবার এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখছেন। মনে হচ্ছে, আরও কিছু খাওয়ার ইচ্ছে।

"দাদু আরও কিছু খাবে?"

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেন লোকটি। তারপর আবার দৃষ্টিহীন চোখে সামনের শো-কেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কলা, বিস্কুট, চকোলেট এনে একটা প্লেটে করে দাদুকে দিল দীপু। নিজের খাবার নিজে নিয়ে খাওয়ার অভ্যেস নেই ওর। আর কারও জন্য নিয়ে আসা? ভাবাই যায় না।

দাদু খান। সেই ফাঁকে প্রিয় টিভি শো দেখতে শুরু করল দীপু। সিনচ্যানের একটা বেশ মজার মুভি হচ্ছে। সিনচ্যান একটা ম্যাজিক বল পেয়েছে কোত্থেকে। সেটা হাতে নিলেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে ও। দেখতে-দেখতে ঘরে উপস্থিত দাদুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল দীপু। খানিকবাদে তাকিয়ে দ্যাখে, দাদুর প্লেট একেবারে পরিষ্কার। সোফায় পা তুলে বসে ঘাড় হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন দাদু।

মুশকিল, সত্যিই মুশকিল। মা-বাবা যদি জানতে পারেন যে, একটা অজানা-অচেনা লোককে এভাবে ঘরে ডেকে আনা হয়েছে, তা হলে পরের দিন থেকে দরজার বাইরে গেটেও তালা পড়ে যাবে।

"দাদু, ও দাদু, তুমি বাড়ি যাবে না?"

বেশ খানিকটা ধাক্কাধাক্কির পর দাদু চোখ খুললেন। তারপর একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে, অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আচ্ছা বিপদ। যাকগে, বাবা-মায়ের আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। নিশ্চিন্তে আবার সিনচ্যানের সিনেমাটা দেখতে বসে গেল দীপু।

ঘণ্টাদেড়েক বাদে আবার খেয়াল হল। দাদু ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে বসেছেন। টেবিলের উপরে রাখা দীপুর স্কুলের ওয়ার্কবুক আর পেনসিলটা নিয়ে কী সব আঁকিবুকি কাটছেন। উঁকি মেরে দেখল দীপু। একটা রোগা ছেলে আর একটা মোটা ছেলের ছবি আঁকছেন দাদু। দীপুর মতো অবশ্য অত ভাল আঁকার হাত নয়। কী করে হবে? দীপু তো আঁকার মাস্টারমশাইয়ের কাছে আঁকা শেখে। দাদু কি শেখেন? নিশ্চয়ই নয়।

বাবা বলেন, আঁকা শিখতে অনেক টাকা লাগে। দাদুর কি আর অত টাকা আছে? না বোধহয়। তা হলে আর ওরকম নোংরা ধুতি আর একগাল দাড়ি হয় নাকি?

"দাদু ও দাদু, তুমি ওর ছবি আঁকতে পারবে?"

"কার সোনা?" আস্তে-আস্তে বলেন দাদু। ডাকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত আপনার টান আছে।

"ওই-ওই যে, টিভিতে দেখছ না সিনচ্যান? ওই ছেলেটার।"

"অ।" বলে আবার মাথা নিচু করে পেনসিলের আঁচড় দিতে শুরু করলেন দাদু আগের ছবিটাতেই। সেই মোটা ছেলেটির মাথায় একটা টুপি আঁকছেন। দীপুর একটু রাগই হয়।

"কী দাদু, সিনচ্যানকে আঁকবে না?"

"না।"

"কেন? তোমার ছবির ওই ছেলে দুটো তো বিচ্ছিরি। সিনচ্যানকে অনেক ভাল দেখতে। জানো তো, ও ভারী দুষ্টু। বাবা-মা না থাকলেই নানা দুষ্টমি করে। ওর আবার এক বোন আছে।"

সিনচ্যানের গল্প বলতে থাকে দীপু। ছবির থেকে মুখ সরিয়ে দীপুর দিকে তাকিয়ে থাকেন দাদু। বেশ খানিকক্ষণ শোনার পরে আবার আঁকার

দিকে মন দেন। দীপু এবার ভীষণ বিরক্ত হয়। দাদু তো কথাই বলতে চান না।

এবার লুডো নিয়ে আসে দীপু। এই লুডোটা বাড়িতে পড়েই থাকে। খেলার লোক নেই। কতদিন বাবা আর মাকে সাধাসাধি করেছে। কিন্তু ওঁদের কোনও আগ্রহই নেই।

'দাদু, খেলবে লুডো? সাপলুডো?"

"হ্যাঁ" এতক্ষণ বাদে বেশ জোরে উত্তর পায়। যাক, দাদুটা তা হলে অতটা বোরিং নয়।

"কিন্তু", একটু ভেবে দাদু বলেন, "আমার সবুজ ঘুঁটি চাই, সবুজ ঘুঁটি।"

দীপু রাজি হয়। লাল ঘুঁটিই ওর বেশি পছন্দ।

খেলা এগোয়। সাপ, সিঁড়ি, নামা, ওঠা। দাদু, কখনও কখনও হাসছেন। কখনও বা সাপের মুখে পড়ে ব্যাজার হয়ে বসে থাকছেন।

খেলতে খেলতে দীপু বলে, "দাদু, তোমার বাড়ি কোথায়?"

দাদু মুখ তোলেন। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে ওঠেন, "এটা না?"

"না দাদু, এটা তো আমাদের ফ্ল্যাট। আমি, মা, বাবা থাকি। ওঁরা খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন। সিনেমা দেখতে গিয়েছেন।"

"তা আমাকে ওরা থাকতে দেবে না, তাই না?"

দীপু ভারী চিন্তায় পড়ে যায়। মাসি মাঝে-মাঝে এসে থেকে যায়। ড্রাইভার কিশোরকাকু, সেও কখনও সখনও থাকে বটে। কিন্তু দাদু?

'তুমি কি কোনও কাজ জানো দাদু?"

"না," সংক্ষেপে উত্তর দেন দাদু।

"তা হলে তোমাকে থাকতে দেবে না। কাজ জানে না, এরকম লোকদের ওরা থাকতে দেয় না। এই তো দ্যাখো না, আমার ঠাম্মা।

তারও তোমার মতো অনেক বয়স। কিন্তু ঠাম্মার শরীর খারাপ। শুধু শুয়ে থাকে। তাই দূরে একটা বাড়িতে থাকে।"

"তোমার দাদু?" এতক্ষণে দীপুর কথা শুনছেন বলে মনে হল।

"নেই, আমি দেখিইনি।"

"হুঁ", বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর তারপরেই এক ছক্কা দুই পেয়ে সরাসরি নব্বইয়ের ঘরে যান দাদু। ভারী খুশি হয়ে বলে ওঠেন, "আর মোটে একটা সাপ।"

"দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি," বলে বেশ খানিকক্ষণ নাড়িয়ে ছক্কাটা ফ্যালে দীপু। নাহ্, ফের দুই। পুট পড়লেও একটা সিঁড়ি পেত দীপু।

"দাদু তোমার বাড়ি নেই?"

খানিকবাদে দাদু বলে ওঠেন, "আছে, খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তা তোমার কাছে অ্যাড্রেস নেই?"

"থাকার কথা, তাই না?" বলে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ান দাদু।

"দাঁড়াও, আমি দেখছি," বলে দীপুও দাদুর পকেটে হাত ঢোকায়।

'এই, এই তো দাদু, তোমার পকেটে একটা কাগজ। কিন্তু তোমার কাছে টাকা, মানিব্যাগ এসব নেই।"

দাদুর অবশ্য তাতে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তিনি ফেলে শেষ সাপটাও পেরিয়ে আটানব্বইয়ে পৌঁছে খুব খুশি খুশি ভাব। দীপু কাগজটায় চোখ বোলায়। ইংরেজিতে লেখা।

"দাদু, তোমার আর চিন্তা নেই। অ্যাড্রেস পেয়ে গিয়েছি। আমি এখনই বিল্টুদাকে ডাকছি। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। ও সব জায়গা চেনে। তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে।"

দাদুর মুখে তবু হাসি নেই। শুধু বলে ওঠেন, "কোন বাড়ি?"

"ওই দ্যাখো, নীচে দমদমও লেখা আছে। তার মানে এখান থেকে

দূরে নয়।”

দাদু পিছনে হেলান দিয়ে বসেন। “বাড়ি?”আস্তে-আস্তে বলতে থাকেন, ‘সেখানে গাছ ছিল, পুকুর ছিল, কত লোকজন ছিল। আমরা বটগাছের তলায় বসে গল্প করতাম, মাঠে ফুটবল খেলতাম, ছিপ দিয়ে মাছ ধরতাম। এটা বাড়ি নয়। এখানে লোক নেই, কেউ নেই। শুধু কতকগুলো চেয়ার, খাট, আলমারি...।” দাদু বলতে থাকেন। দীপুও অবাক হয়ে শুনতে থাকে।

খানিকবাদে দীপু বলে, “তা দাদু, তোমার আগের কথা এত মনে আছে, আর বাড়ি কোথায় তা মনে নেই?”

দাদু বলে ওঠেন, “এখনকার কথা মনে থাকে না। কেমন যেন সব হারিয়ে যায়। ঠিক যেমন ওরাও হারিয়ে গিয়েছে।”

“কারা দাদু?”

চুপ করে থাকেন দাদু। খানিকবাদে বলে ওঠেন, “সবাই, মন্টু, সন্তু, সবাই।”

আধঘণ্টা বাদে দীপু বিল্টুদাকে ডাকে। বিল্টুদা দীপুর চেয়ে অনেক বড়। সবে কলেজে ঢুকেছে। আজ বাড়িতেই ছিল। বিল্টুদা আসার পরে দীপু ওর সঙ্গে দাদুকে নিয়ে বেরোয়। বেশি দূরে নয়। ওদের কমপ্লেক্সের উল্টোদিকেই একটা গলি আছে, সেখানকারই অ্যাড্রেস। বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগে না। একটাই বিল্ডিং, অনেকগুলো ফ্ল্যাট। একতলার পিছনের দিকের ফ্ল্যাটটা দাদুর।

বেল বাজাতে একজন লোক বেরিয়ে আসে। দেখে মনে হয়, কাজের লোকই হবে। দাদুকে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, “সকাল থেকে আপনাকে আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। রান্না করে এসে দেখি, আপনি আর বারান্দায় নেই। বায়না করছিলেন বলে বাইরে চেয়ার টেনে বসতে

দিয়েছিলাম। আর দেব না। দাদাবাবুকেও এই ফোন করলাম। উনিও ভারী চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। কী যে করেন না। কতবার বলেছি, বাড়ি থেকে বেরুবেন না। ভুলো মানুষ, ডাক্তার একা বেরুতে বারণ করেছেন।”

দাদু কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকেন অপরাধীর মতো। দাদুর কাজের লোকের নাম ভগীরথ। দীপুরা জানতে পারে যে, দাদু একাই থাকেন এখানে। প্রায় তিন বছর। দুই ছেলেই বাইরে থাকে। এখনকার কোনও কথা দাদুর খেয়াল থাকে না। সব ভুলে যান। তাই সব সময় সঙ্গে ঠিকানা রাখা থাকে।

এসব কথার মধ্যে দাদু আবার বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। হাতে একটা পাতলা কমিক্সের বই। বইটা দীপুর হাতে দিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, “পড়ো, আমার আঁকা।”

বিল্টুদা বইয়ের দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল, ‘আপনিই সনাতন চৌধুরী? আপনার কত বাংলা কমিক্স পড়েছি একসময়।”

দাদু হাসেন। তারপর দীপুর দিকে তাকিয়ে বলেন, “তোমার টিভির ওই ছেলেটির চেয়ে আমার এই ছেলেগুলো অনেক বেশি ভালো।”

“দাদু, তুমি আবার আসবে আমাদের বাড়িতে? কবে আসবে?”

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন দাদু। তারপর ভগীরথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, “দরজা খোলা পেলেই।”



পশ্চিমের ঘর

আমার দাদুকে আমি কোনওদিন দেখিনি। দেখব কী করে! আমার জন্মানোর দশ বছর আগেই উনি চলে যান। তবে ওঁর একটা ছবি আছে। সেই ছবির সঙ্গেই আমি পরিচিত।

দেখেই বোঝা যায় শিক্ষক ছিলেন। পরনে ধুতি। নাকের ওপর বিশাল কালো ফ্রেমের চশমা। কাঁধের ওপর চাদর ফেলা। হাতে বই। মুখে গুরুগম্ভীর ভাব। দেখেই ভয় ভয় করে। উনি ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। খলসেখালি নামে পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে স্কুলমাস্টারি করতেন। পরে প্রধানশিক্ষকও হন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলও খেটেছেন।

মায়ের মুখে শুনেছি দাদু নাকি ছিলেন অঙ্কপাগল। বিজ্ঞানেও দারুণ আগ্রহ ছিল। আর ছিল বই পড়া ও লেখার নেশা। আমার অবশ্য দাদুর অঙ্কজ্ঞান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে-ধারণার কারণ, আমার মায়ের অঙ্কজ্ঞান। আমিও উত্তরাধিকারসূত্রে অঙ্কে সেই দুর্বলতা পেয়েছি। তবে দাদুর সাহস নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও দাদুর দিদিমার সঙ্গে ব্যবহারে সে সাহস প্রকাশ পেত না। ছাত্র পড়াতে দূর-দূরান্তে যেতেন। গ্রামের দিকে সন্ধে হতে না হতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা। তবুও রাত এগারোটা-বারোটার আগে দাদুর বাড়িতে ফেরা নেই। শেষে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত,একগাদা বই বগলে নিয়ে দাদু ঢুকতেন। দিদিমার রণচন্ডী মুখ দেখে বলতেন, 'বিনোদটা এত বোকা, মাথায় কিছু ঢোকে না। বোঝাতে গিয়ে এত দেরি'। কিংবা এই ধরনের কিছু। দিদিমা অবশ্য এই ধরনের উত্তরে যে খুব একটা খুশি হতেন না, তা বলা বাহুল্য। আরও,

আরও অনেক গুণ ছিল দাদুর। গ্রামের সবাই ওঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। দেশভাগের পরে পূর্ব্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন। এর বছরখানেকের মধ্যেই হৃদরোগে দাদুর মৃত্যু হয়। ওখানকার দোতালা দালানবাড়ি অবশ্য আজও আছে। ওঁর মৃত্যুর পর অবশ্য আমাদের যোগাযোগ এই বাড়ির সঙ্গে খুবই কম। খালি দুর্গাপুজো যখন হয় মামা-মাসি—আমরা সকলে মিলে যাই। তিন-চারদিন মজায় কাটিয়ে চলে আসি। ও-বাড়ি দেখাশোনা করেন নবেন্দুকাকা। বারো মাস ওখানেই থাকেন। আশপাশের জমিজমার ফসল দিয়ে ওঁর চলে, বাড়িরও একটু-আধটু রক্ষণাবেক্ষণ হয়।

এবার পুজোয় যথারীতি আমরা সকলে মিলে গিয়েছি। গ্রামের পুজো। সারা গ্রামের ভিড় উপচে পড়েছে বাড়ির চাতালে। পুজো দেখতে। সামনে মেলা বসে। আমরা সবাই হইহুল্লোড় করছি, হঠাৎ আমার চোখ পড়ল দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরটায়। ও-ঘরটা আমি কোনদিনও খোলা দেখিনি। প্রতিবারই দেখি এর দরজায় দুটো বড় তালা ঝোলানো। খুব কৌতুহল হল। নবেন্দুকাকাকে বললাম। কাকা বেশ কায়দা করে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ও-ঘরটা খুলতে বললাম। এবার নবেন্দুকাকা বললেন, "পুজোটা কেটে যাক। তারপর খুলব।" কী আর করা যায়! দশমীর অপেক্ষায় রইলাম।

দশমীর দিন আবার বললাম। এবার মায়ের উপস্থিতিতে। আমাকে মা ধমক দিয়ে বললেন, "কী দরকার তোর ওই ঘরে? এত ঘর আছে। ওগুলোতে যা, গিয়ে খেল!"

মায়ের ধমক খেয়ে উৎসাহ আরও বাড়ল। শেষে ছোটমামার কাছে কথাটা পাড়লাম। ছোটমামা অবশ্য আমাকে এড়িয়ে গেল না, বুঝিয়ে যা বলল, তা হল এইরকম—"ওই ঘরটা ছিল দাদুর পড়ার ঘর। বেশিরভাগ

সময় দাদু ওই ঘরটাতেই কাটাতেন। কাউকে ঢুকতে দিতেন না। কী যে করতেন একা-একা, বলা মুশকিল! যখন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন তখন ও-ঘরের দরজায় একটা মস্ত তালা ঝুলিয়ে বারবার করে বলে যান, যাতে ওই ঘরে কেউ না ঢোকে। দাদুর নির্দেশ। সবাই তাই মেনে চলে। দাদুর মৃত্যুশয্যায় দিদিমা ওই ঘরটাতে কী আছে জানতে চাইলে দাদু একটা ভারী মজার কবিতা শুনিয়েছিলেন;— "আমার স্বপ্ন, ধন যত / আছে ওতে রক্ষিত। / আমাকে খুঁজে পাবে / ও-ঘরের আসবাবে। / ও-ঘরে ঢুকবে যে / আমাকে পাবে যে সে।"

এর বেশি আর কিছুই বলতে চাননি। দাদু ওঁর উইলে ওঁর সম্পত্তি, বাড়ি সবার মধ্যে ভাগাভাগি করলেও ওই ঘরটা কিন্তু কাউকেই দিয়ে যাননি।

সবাই মুখে যতই বৈরাগ্য দেখাক, দাদুর মুখে কবিতাটা শোনার পর সবারই নজর ছিল ওই ঘরটার ওপর। কী আছে ওতে? বড়মামা দাদুর মৃত্যুর পর দেশের বাড়িতে যান। উদ্দেশ্য, ওই ঘরটা খোলা। দেখা, কী আছে না আছে। কী এত দামী জিনিস আছে? ঘটনাটা ঘটল দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই। শোঁ শোঁ করে আওয়াজ। ঝোড়ো হাওয়া যেন ঘরটাতে ঢুকতে লাগল। দেওয়াল থেকে উঠে আসছিল বীভৎস চেহারার অদ্ভুত সব জীব। ঘরের মধ্যের দুটো মূর্তি আপনা-আপনি পায়ে হেঁটে কাছাকাছি চলে আসছিল। এরই মধ্যে নাকি আবার শোনা যাচ্ছিল কারও গোঙানী বা চাপা গর্জন। এসব দেখে বড়মামা আঁ আঁ করে অজ্ঞান হলেন। জ্ঞান ফিরল একটু পরে। স্বাভাবিকভাবে বড়মামা পরে এসব বলায় কেউই বিশ্বাস করেনি। বড়মামার ভিতু বলে এমনিতেই পরিচিতি ছিল। সেটা এই ঘটনাতে আর একটু বেড়েছিল। ওঁর ভিতু পরিচয়টা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

এর পর মেজোমামার পালা। সাহসে উনিও কম যান না। উনি দিনক্ষণ-পাঁজি দেখে ও-ঘরের দরজা খুললেন। আর খোলার পরই যা দেখলেন, তা অনেক ভূতুড়ে বাড়ির গল্পকেও হার মানায়। আস্তে আস্তে ঘরের উলটো দিকের দেওয়ালে ফুটে উঠেছিল দাদুর মুখ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও নাকি আস্তে আস্তে নড়াচড়া করছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে কেউ যেন ধাক্কা মেরে মেজোমামাকে ঘরের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করছিল। ঘরের মধ্যে রাখা দরজার দু'দিকের দুটো শোলার মূর্তি আরও কাছাকাছি এসে মেজোমামাকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করছিল। মেজোমামা কোনওরকমে দরজা বন্ধ করে পালিয়ে বাঁচেন। এই ঘটনার মাসদুয়েক পরেও কলকাতার বাড়িতে মাঝরাতে উঠে মেজোমামা দাদুর কবিতা আওড়াতেন। স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে বলতেন, "আমাকে খুঁজে পাবে, ও-ঘরের আসবাবে।"

যাক, সে অবশ্য অনেক দিনের কথা। এর মাঝে কাশীতে গিয়ে দাদুর আত্মার শান্তি কামনা করে এসেছে সবাই। বাড়ির কুলপুরোহিত ওই ঘর খুলতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য উনি কিছু না বললেও ঘর খুব সম্ভবত আর খোলা হত না। এরকম দু'টো ঘটনার পর মামাবাড়ির আর কারও খোলার মতো সাহস ছিল না। ওই ঘরের দরজায় তাই দুটো শক্ত বড় তালা পড়েছে। ওই ঘর সম্বন্ধে কৌতূহল যেমন বেড়েছে, ভয়ও বেড়েছে তেমনই।

ছোটমামার কাছে এসব শোনার পর আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। আমি যে খুব সাহসী, তা কিন্তু নয়। শুঁয়োপোকা, আরশোলা, মাকড়সা দেখে ভয়ে লাফালাফি করি। তবে ভূত বা ভূতুড়ে কিছু বিশ্বাস করি না। বরং একটা বাড়তি কৌতূহল হয়।

তবে ও-ঘরে ঢোকা নিয়ে ভয়টা ভূতের নয়, ভয়টা মায়ের। চাবি

থাকে নবেন্দুকাকার কাছে। নবেন্দুকাকাকে কাকা বললেও উনি আসলে দাদুরই সমবয়সী। মামারাও কাকা বলেন। আমিও দেখাদেখি তাই বলি। বয়সে আশি-পঁচাশি হবে। চোখে ছানি। দাবা খেলায় দারুণ আগ্রহ। আমার সঙ্গে দাবা খেলে খুব আনন্দ পান। হয়তো রোজই আমি হেরে যাই বলে। চাবি চেয়ে তো পাওয়া যাবে না, খেলার ফাঁকে নিয়ে নিতে হবে। সেদিন নিজের থেকেই দাবার বোর্ড আর ঘুঁটি নিয়ে নবেন্দুকাকার ঘরে গেলাম। উনি তো দাবা আর দাবার সঙ্গে আমায় দেখে দারুণ খুশি। খেলা শুরু হল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে পরের চালটা ভাবছেন, এমন একটা সময় চাবিটা আমার অধিকারে এল। খেলার কষ্টটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হল না। কয়েক চালের মধ্যেই নবেন্দুকাকার গজ ও নৌকোর চাপে আমার রাজা গদিচ্যুত হল।

সন্ধের দিকটায় ঘরটা খুলতে সাহস হল না। পরের দিনের অপেক্ষায় রইলাম। ঘুম ভাঙল সাতটা নাগাদ। আটটার সময় ওই ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ। ফুলে-ফুলে লাল হয়ে আছে। জোর হাওয়া দিচ্ছে। নীচে দালান থেকে মেজোমামার গলা শোনা যাচ্ছে। আর দেরি নয়! কখন কে এসে পড়বে! দুটো তালাই কষ্টেসৃষ্টে খোলা গেল। না খুলে-খুলে ঘরের দরজাটা জ্যাম হয়ে গেছে, শেষে এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম। সঙ্গে-সঙ্গে সত্যিই বাতাসের বেগ যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। ঘরে যেটুকু আলো, তাতে সবকিছু স্পষ্ট না দেখা গেলেও কোথায় কী আছে বোঝা যাচ্ছে। চোখ পড়ল সামনের দেওয়ালে। দেওয়ালে আঁকা নকশা বদলে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। সবুজ আলোতে একটা মুখ ফুটে উঠেছে, দাদুরই। একটা পা দরজার বাইরে করে নিলাম। সহজে যাতে বিপদ বুঝে পালানো যায়। এর মাঝে নজর পড়ল দু' দিকে রাখা শোলার মূর্তিগুলোর ওপর। ওরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। শুরু

হল একটা অদ্ভুত ধরনের গোঙানির আওয়াজ। দেওয়ালের ছবি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর পরিবর্তন হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে একটা সবুজ আলোর আভা। খেয়াল করতে চোখে পড়ল ঘরের মধ্যে রাখা সবুজ একটা আলো, যা ছড়িয়ে পড়ছে সামনের দেওয়ালে। বাইরের আলো ওই দেওয়ালে এসে পড়তে পারছে না মূর্তিগুলোর আড়ালের জন্য।

হঠাৎ মনে পড়ল পদার্থবিজ্ঞানে পড়েছি, সবুজ আলো খালি সবুজ আলোকেই প্রতিফলিত করে। বাকি সব রং সবুজ আলোতে দেখলে কালো দেখাবে। বুঝতে দেরি হল না যে ওই সামনের দেওয়ালেও একই জিনিস ঘটছে। বিভিন্ন নকশার মধ্যে ফুটে উঠেছে খালি সবুজ রঙের নকশাগুলো। আর বাকি অংশটা কালো হয়ে গেছে সেটাই দাদুর মুখের চেহারা নিয়েছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে ওই সবুজ আলো এল কোত্থেকে? ঘরের চারদিক লক্ষ করতে সবুজ একটা ল্যাম্প চোখে পড়ল। ওই নক্শার ঠিক বিপরীত দিকের দেওয়ালে লাগানো। এই আলোর আর-একটা উৎস ঘরের ওপর দিকের জানলা। জানলার কাচে সবুজ ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে। সূর্যের আলোর খালি সবুজ অংশ ঘরে ঢুকছে। হঠাৎ খেয়াল হল, আচ্ছা, দরজাটা বন্ধ করলে কী হয়? সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দরজা বন্ধ করলাম। ভূতুড়ে ঘরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ পথ এখন বন্ধ। মূর্তিগুলোর চলা বন্ধ হয়ে গেল। এবার পুরো ঘটনাটাই মনে পড়ে দারুণ হাসি পেল। এ তো খুবই সাধারণ ঘটনা। বার্নোলির সুত্র। যেখানে বাতাসের বেগ বেশি, সেখানে চাপ কমে যায়। যার জন্য প্লেন উপরে ওঠে, বুনসেন বার্নার জ্বলে, স্পিন বল ঘোরে। ঠিক তাই। ঘরটা খুললেই জোর পুবের হাওয়া ঘরটায় ঢুকতে থাকে। অর্থাৎ মূর্তিগুলোর সামনের দিক দিয়ে জোর বাতাস বইতে থাকে। ফলে

সামনের দিকে চাপ কমে যায়। মূর্তির পেছনে দিকে বাতাসের বেগ কম হওয়ায়, চাপ বেশি। তাই মূর্তি দুটো পরস্পরের দিকে এগোতে থাকে।

এবার খালি বাকি রইল আওয়াজটা। সেটার উৎসও বের করতে দেরি হল না। শব্দটা আসছে বাঁ দিকের টেবিলের নীচে রাখা একটা চওড়া কালো বাক্সের মধ্যে থেকে। ওর মধ্যে কোনও লংপ্লেয়িং রের্কড রাখা আছে। এ ছাড়া চালানো হয়েছে একটা এগ্‌জস্ট ফ্যান। যা ঘরের থেকে বাতাস বের করে দিয়ে ঘরে বাতাসের চাপ কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বাইরের বাতাস আরও জোরে ঢুকছে।

কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ আলো, এগ্‌জস্ট ফ্যান ও ওই লংপ্লেয়িং রেকর্ডটা চালু হচ্ছে কীভাবে? নিশ্চয়ই দরজায় কিছু কারিকুরি আছে। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ঠিক তাই। খুব খেয়াল না করলে চোখে পড়বে না এরকমভাবে দরজার ঠিক পাশে ছোট একটা বোর্ডে লাগানো তিনটে সুইচ। দরজা খুললে একটা লোহার রড লিভারের মতো কাজ করে সুইচ তিনটে চালিয়ে দিচ্ছে। শুরু হচ্ছে বায়ুনিকাশী যন্ত্র, লংপ্লেয়িং রেকর্ড আর জ্বলে উঠছে সবুজ আলো।

এসব বোঝার পরও যেটা প্রশ্নই থেকে গেল, তা হল এসব করে ভয় দেখানোর কী দরকার ছিল?

ঘরের অন্যান্য জিনিসের ওপর এবার চোখ বোলাতে থাকলাম। ঘরের বাঁ দিকে পড়ার টেবিল। সেটাতে কিছু রাখা নেই। তার পেছনের দেওয়ালে তাক-তাক করা। তাতে অজস্র বই, খাতা। খাতাগুলো বির্বণ। ভেতরের কাগজ পুরনো হয়ে লালচে হয়ে গেছে। তবে, তা সত্বেও মনে হয়। কেউ যেন নিয়মিত এখনও ওগুলো নাড়াচাড়া করে। তা না হলে এভাবে পরিপাটি করে রাখা! যে কাপড়ে ঢাকা, তাও খুব পুরনো বলে মনে হয় না। একটা খাতা তাক থেকে টেনে নিলাম। দাদুর হাতে লেখা

কীসব। পরে বুঝলাম, পুরোটাই গান্ধী-আরউইন চুক্তির ওপর লেখা। বোধ হয় কোনও স্বদেশি পত্রিকার জন্য লেখা। নির্ঘাত ১৯৩২ সালের কাছাকাছি হবে। একটু নাড়াচাড়া করে রেখে দিলাম। এ-ঘরের রহস্য সবাইকে বলব বলে বের হব-হব করছি, হঠাৎ কী একটা যেন উড়ে এসে বসল আমার কাঁধে। ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে আর্তনাদ করে উঠলাম। আরশোলা।

দরজা খুলে বেরোতেই দেখি সবাই এ-ঘরের দিকেই আসছে। আমার চিৎকার শুনেছে। নবেন্দুকাকাও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এদিকে আসছেন। সবকিছু বলার পরে (চিৎকারের কারণটা ছাড়া) যে-প্রশ্নটার জবাব এখনও পাইনি, সেটা নবেন্দুকাকাকেই জিজ্ঞেস করলাম। এই ঘরকে এভাবে সাজিয়ে দাদু সকলের মনে ভয় সৃষ্টি করেছিলেন কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস নবেন্দুকাকার এই ঘরটা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা আছে। সত্যিই তাই। নবেন্দুকাকা সবাইকে যা বললেন তা হল এই রকম—"দাদুর খুব আফশোস ছিল যে, ওঁর কোনও ছেলেই ওঁর মতো সাহসী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেনি। মাঝে-মাঝেই নবেন্দুকাকাকে তা বলতেন। এই ঘরটাই ছিল ওঁর সবচেয়ে আপন। জীবনে লেখা অজস্র গল্প, কবিতা, বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ সবই এ-ঘরে রাখা ছিল। ওঁর ইচ্ছে ছিল, যেন কোনও অপাত্রে ওঁর লেখা ওইসব জিনিস না যায়। সেরকম কোনও বংশধরই যেন ওঁর এই প্রিয় জিনিসগুলো পায়, যার জানার ইচ্ছে আছে, আছে উপযুক্ত সৎসাহস, সেই ওই লেখাগুলোকে উপযুক্ত মূল্য দিতে পারবে। নবেন্দুকাকাকে তাই সবকিছু জানিয়ে উনি বলে গিয়েছিলেন এই ঘরের সম্বন্ধে যাতে কাউকে কিছু না বলা হয়। একদম কিছু না জেনে যে এসে এর রহস্য বের করতে পারবে, তার হাতেই যেন পৌঁছয় ওঁর সারাজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। ওঁর জীবনে দেখা জীবনের মানচিত্র।

নবেন্দুকাকা এসব বলার পর আমাকে বললেন, আজ থেকে, আমিই দাদুর লেখা ওইসব বিভিন্ন খাতা-বইপত্রের মালিক। দাদু যেরকমটি চেয়েছিলেন।

হাসি-হাসি মুখে এবার মায়ের দিকে তাকালাম। চোখেমুখে আমার বিজয়ীর দৃষ্টি। মা কিন্তু চোখ গোল-গোল করে কান মলে দিয়ে বললেন, "তোকে না মানা করেছিলাম, এ-ঘরে ঢুকতে! শুধু অবাধ্যতা।"

আইনস্টাইনের দূরদৃষ্টি

ছ'টা বাজল, অথচ শনিবারের আসরে অনিলিখার দেখা নেই। বাইরের মেঘলা আকাশের মতই আজকে আমাদের আসরের পরিবেশ। বলতে গেলে আলোচনার বিষয়ই নেই। শেষে আমাদের আলোচনা হামাগুড়ি দিয়ে সেই রাজনীতি, ভোট, ক্রিকেট—এসবের দিকে এগুচ্ছে, এমন সময় ঝড়ের বেগে অনিলিখা ঘরে ঢুকল।

হাতে একটা দূরবীন। চেয়ার টেনে বসে দূরবীনটা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে সযত্নে ঢুকিয়ে রাখল।

ওদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,

—কোথায় পেলে? বড় বাজারে? কত'য়?

যেন কিছুই শুনতে পায়নি এমনভাবে অনিলিখা সামনের টেবিলে রাখা জলের বোতলটা তুলে ধীরে সুস্থে জল খেল।

কোনো উত্তর না পেয়ে বিশ্বজিৎদা খানিকটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলে উঠল—দূরবীন কোনো কাজের জিনিস নয়। যা একটু লাগে ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গেলে। তাও আজকাল টিভি'র যুগে মাঠে যাওয়ার আর দরকার হয় না। আমার যে দূরবীনটা ছিল সেটা পড়ে থেকে খারাপ

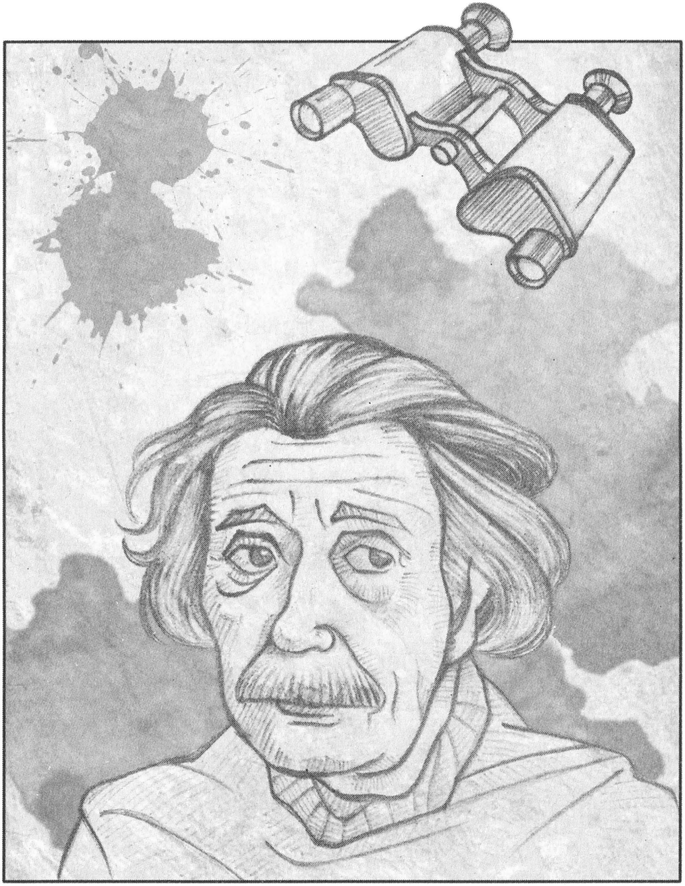
হতে বসেছে। ওটাও বড় বাজারে কেনা। দু বছর আগে। দু'হাজারের মতো দাম নিয়েছিল।

এতক্ষণে অনিলিখা মুখ খুলল। বিশ্বজিৎদাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—না এটা বড় বাজারে কেনা নয়। তবে এটা কোথা থেকে পেয়েছি তা বলার আগে দূরবীন সংক্রান্ত একটা অভিজ্ঞতার কথা শোনাই। বছর দশেক আগের কথা।

আমরা সবাই আরেকটা আকর্ষণীয় গল্প শোনার আশায় নড়েচড়ে বসলাম। অনিলিখার এত ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছে। আর পাকে চক্রে অনিলিখাকে কেন্দ্র করেই ঘটনাগুলো ঘটে। কই, আমাদের ভাগ্যে তো ওরকম ঘটনা ঘটে না। যাই হোক, আমরা তো বটেই, বিশ্বজিৎদা নড়েচড়ে খাটের তাকিয়ায় ভর দিয়ে বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনিলিখা শুরু করল।

—অ্যান আর্বার আমেরিকার বেশ পুরনো শহর, ছোট শহর। এখানেই বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অফ মিসিগান। এই শহরে প্রচুর কমবয়সী স্টুডেন্টের ভিড়। আমার চাকুরি জীবনের শুরুর কয়েক মাস কেটেছিল এখানেই। বন্ধু-বান্ধব না থাকায় অবসর কাটানোটা ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তা না হলে রোজ সেই অফিস আর বাড়ি ফিরে রান্না। ছুটির দিনে তাই গ্যারেজ সেলে ঘুরে ঘুরে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে আসতাম। ওখানে গ্যারেজ সেলে সবাই বাড়ির পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে। তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। এরপরে ঠান্ডা আরো বাড়লে লোক আর আসবে না। বাড়ির বাইরে জিনিস ছড়িয়ে বসাও অসম্ভব। এ'তো আর ভারতের ঠান্ডা নয়, হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। তাই বাড়ি থেকে পুরনো জিনিসপত্র সরানোর ওটাই ছিল আদর্শ সময়। তা, সেদিন সেরকমই একটা গ্যারেজ সেলে গিয়েছিলাম। এক বৃদ্ধা ওনার পুরনো জামা-কাপড়, আসবাবপত্র ও আরও



বেশ কিছু টুকিটাকি জিনিস ছড়িয়ে বসে আছেন।

টেবিলের উপরে একটা কালো দূরবীন রাখা। ওনাকে সম্ভাষণ করে ওটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলাম— কত পড়বে?

বৃদ্ধার বয়স আশির কাছাকাছি। চোখে কালো সানগ্লাস। পরনে একটা ফুলহাতা শার্ট আর কালো প্যান্ট। বৃদ্ধা খুব কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দূরবীনটা হাতে তুলে নিলেন। তারপর ওর উপরে লাগানো সাদা কাগজটা আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন—আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না। কত লেখা আছে বলবে? পিটার, পিটার!

বুঝলাম, পিটার বলে কেউ ঐ দামগুলো লিখছে। তা পিটার না থাকায় আমিই দামটা দেখে বললাম—

—দশ ডলার, তা আট ডলারে হবে?

টাকার প্রয়োজনের থেকেও গ্যারেজ সেল অনেকেরই নেশা। তবে প্রশ্নটা করেই মনে হয়েছিল যে, প্রয়োজনও খানিকটা আছে। বৃদ্ধার পোশাকে-আশাকে-স্ক্র্যাচ পড়া চশমায়—গ্যারেজ সেলের জিনিসপত্রে যেন তারই ছাপ। তাই বলার পরই কথা ফিরিয়ে নিলাম,—

—না দশ ডলারেই নেব।

বৃদ্ধা ভারী খুশি হয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, জিনিসটা খুব ভালো। আমি যদিও কোনো দিন ব্যবহার করিনি। চোখেই ভালো দেখি না। তবে জিমের—মানে আমার ছেলের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল দূরবীনটা।

আরও দু'একটা কথা বলার পর দূরবীনটা নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। বড় বড় দোকানে দূরবীনের দাম তখন প্রায় কুড়ি ডলার। অবশ্য ঐ দূরবীনটা নামী কোনো কোম্পানির নয়। কোনো কোম্পানির নামই দেখতে পেলাম না। বেশ পুরনোও। তবে খুব ইন্টারেস্টিং দেখতে। বেশ যত্ন করে রাখা ছিল। সামান্য আঁচড়ও পড়েনি।

সেদিন তারপরে আরও কয়েকটা গ্যারেজে সেলে গেলাম। বাড়িতে যখন ফিরলাম তখন অজস্র টুকিটাকি জিনিসে গাড়ি ভরে গেছে। কয়েকটা ঘর সাজানোর জিনিস, পুরনো ক্যাসেট, সিডি, দূরবীন, টেবিল ল্যাম্প আর একটা ফোল্ডিং ডাইনিং টেবিল। গাড়ির ডিকি থেকে পুরনো ডাইনিং টেবিলটাকে টেনেটুনে বার করে রাখতে ঘন্টা খানেক কেটে গেল। ততক্ষণে দূরবীনটার কথা আমি ভুলেই গেছি।

ঠিক এক সপ্তাহ বাদে টিভি'র ক্যাবিনেটটা পরিষ্কার করতে গিয়ে পাশে রাখা প্লাস্টিকের প্যাকেটের উপর চোখ পড়ল। প্যাকেটের মধ্যে থেকে দূরবীনটা বের করে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলাম।

শনিবার সকাল। ছুটির দিন। সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দূরবীনে চোখ রাখলাম। বড্ড ঝাপসা লাগছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দূরবীনটার ডানদিকে-বাঁদিকে গোলাকার সুইচ। খানিকটা ঘুরিয়ে দেখলাম। তবুও সবই ধোঁয়া ধোঁয়া, অস্পষ্ট।

তাহলে কি দূরবীনটা কাজ করে না? কেনার সময় আমার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। এখানকার লোকেরা সাধারণত ঠকায় না। হয়তো ওই বৃদ্ধা মিথ্যে বলেননি। উনি তো নিজে ব্যবহার করতেন না, ওনার ছেলে করত। তাই হয়তো ওনার অকেজো দূরবীনটার ব্যাপারে জানা ছিল না।

—তা, দূরবীনটা কাজ করে না?—বিশ্বজিৎদা ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল।

—আগে পুরোটা শোন, এখনও তো কিছুই বলিনি। হ্যাঁ, সেদিনের পরে দূরবীনটা নিয়ে অনেকদিন আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি। একটা আবর্জনার মতো রান্নাঘরের ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ারে পড়েছিল। কয়েক মাস পরের ঘটনা। ফুডপ্লাজে বাজার করতে গেছি। হঠাৎ চোখে পড়ল

পাশের বৃদ্ধার দিকে। সেদিনের সেই বৃদ্ধা।

সৌজন্যমূলকভাবে বলে উঠলাম—কেমন আছেন?

বৃদ্ধা আমাকে চিনতে পারেননি। একটু হকচকিয়ে উঠে বললেন,—কে?

আমি আমার পরিচয় দিলাম। জানালাম ওনার সেই অচল দূরবীনটা আমিই কিনেছি। উনি খুবই লজ্জায় পড়ে গেলেন। আমারও খারাপ লাগল। আমার বলাটা উচিত হয়নি।

তখনই উনি বলে উঠলেন —আমি ওটা কোনদিন ব্যবহার করে দেখিনি। চোখে গ্লুকোমা হবার পর থেকে গত দশ বছর তো আমি প্রায় অন্ধই হয়ে গেছি। কিন্তু তার আগেও আমার ও বিষয়ে কোনো কৌতূহল ছিল না। ওটা ছিল আমার ছেলের সম্পত্তি। ওর স্মৃতি হিসেবেই ওটা রেখে দিয়েছিলাম। ওর দিন-রাত জুড়ে ছিল এই দূরবীনটা। শেষে ও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। অন্য কোন কাজ না করে একহাতে দূরবীন নিয়ে বসে সারাদিন কি সব ভাবত। কে জানে কেন এসব করত।

—আচ্ছা, এ দূরবীনটা ও কার কাছ থেকে কিনেছিল?

—ওই দূরবীনটার একটা ইতিহাস আছে। বললে বিশ্বাস করবে না। এটা আমার শ্বশুরমশাই পেয়েছিলেন হিটলারের কাছ থেকে। সেটা উনিশশো পঁয়ত্রিশের কাছে পিঠের ঘটনা। উনি ছিলেন জার্মান সেনা দলের উচ্চপদে। হিটলারের সঙ্গে ওনার ওঠাবসা ছিল। হিটলার তখন সবে ক্ষমতায় এসেছেন। দূরবীনটা হিটলারকে দিয়েছিলেন ওই শতাব্দীর সব থেকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী। হ্যাঁ, আমি আইনস্টাইনের কথা বলছি। আইনস্টাইনের সঙ্গে হিটলারের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আইনস্টাইনের যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবের জন্য ও প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য শত্রুতা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

আইনস্টাইনের দূরদৃষ্টি

আইনস্টাইন জানতেন যে কোনদিন হিটলার ওঁকে বন্দী করার আদেশ দিতে পারেন। তাই আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন উনি।

ওনার দেশ ছাড়ার কয়েকদিন পরেই হিটলারের কাছে নিউর্জাসি থেকে একটা পার্সেল আসে। আইনস্টাইনের পাঠানো পার্সেলের উপর লেখা 'নো ইওর ডেস্টিনি'।

প্রচুর সতর্কতার সঙ্গে পার্সেল খুলে দেখা যায়, কিছুই না—তার মধ্যে একটা দূরবীন।

পরের দিন আমার শ্বশুরমশাই কি একটা সরকারি কাজে হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কথায় কথায় দূরবীনটার কথা এসে পড়ে। হিটলার বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। দূরবীনটা কাজ করছে না। ঘষা কাঁচ লাগানো। কিছুই দেখা যায় না। নেহাৎ রসিকতা করেই নাকি আইনস্টাইন ওনাকে ওটা পাঠিয়েছেন।

হিটলার ওটা শ্বশুরমশাইকে দিয়ে বলেন, কড়া চিঠি লিখে ওই দূরবীনটা যেন ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শ্বশুরমশাই ওই দূরবীনটা বাড়িতে নিয়ে এসে দেখেন কাজ করছে। কিন্তু উনি সেকথা হিটলারকেও বলেননি, আইনস্টাইনকেও ফেরৎ পাঠাননি।

এর কিছু দিন পরে উনি জার্মানি ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন। উনিও নাকি দিন রাত এই দূরবীন নিয়েই পড়ে থাকতেন। পরে সুইসাইড করেন। কি কারণে জানি না। আমার স্বামীর অবশ্য এ ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহল ছিল না।

এই হল দূরবীনটার ইতিহাস। আমার মনে হয় এর কোনো একটা স্যুইচ ঘোরালে বা একটু অ্যাডজাস্ট করলে হয়তো কাজ করে। আমি

সত্যিই এর বেশি কিছু জানি না।

আমি ওনাকে আশ্বস্ত করলাম, দূরবীনটা কাজ না করলেই বা কি? এতে আইনস্টাইন হাত দিয়েছিলেন ভাবলেই তো আমার সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে।

বললাম—তা আপনি তো এটা অকশনেই দিতে পারতেন। অনেক দাম পেতেন।

—কি প্রমাণ যে এটা আইনস্টাইনের হাতে তৈরি, বা হিটলার এটা ব্যবহার করেছিলেন! তাছাড়া এসব নিতান্তই স্পর্শকাতর জিনিস। আমি তো এখনও ভাবলেই লজ্জা পাই যে আমার শ্বশুরমশাই হিটলারের অত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

—তা উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন না?

—না, কেন জানি না, তার আগেই হঠাৎ করে উনি জার্মানি ছেড়ে চলে আসেন। আমার স্বামী তখন স্টুটগার্টে পড়াশুনা করছিলেন। ওকেও স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে চলে আসেন। তারপর ওরা আর জার্মানিতে কখনোই ফেরেনি।

বৃদ্ধার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ কথা বলে বিদায় নিলাম। বয়স হলে এখানে জীবন খুবই দুঃসহ। নিজেকেই সবকিছু করতে হয়, তাই ওনার কথা ভেবে বেশ খারাপ লাগছিল।

সেদিন দোকান থেকে ফিরে দূরবীনটা নিয়ে পড়লাম। দুই প্রজন্ম যখন এই দূরবীন নিয়ে কাটিয়েছে, আর এর স্রষ্টা যখন আইনস্টাইন তখন দূরবীন একবারে কাজ করে না এটা অবিশ্বাস্য। নিশ্চয়ই কোনো কৌশল আছে।

দূরের উইলো গাছটার উপর চোখ রাখলাম। ডানদিকের সুইচটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম যদি কিছু দেখা যায়। খানিকক্ষণ বাদে

কতকগুলো কালো কালো দাগ দেখা গেল। কিন্তু দাগগুলো এত কাঁপছে যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাঁদিকের চাকাটা ঘোরাতে থাকলাম। দাগগুলোর কাঁপা কমতে শুরু করল। এভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে একটা জায়গায় দেখলাম ছবিটা স্থির হয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এ কিসের ছবি? বড় একটা চাকতি পড়ে আছে। দূরবীন সরিয়ে তাকালাম উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। আমার প্রতিবেশী মিঃ অ্যান্ড মিসেস কুপার ব্যালকনিতে বসে আছেন। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ভারি অবাক হয়ে গেলাম। এ কি? এতো এক বড় উল্টোনো শঙ্কু। শঙ্কুর গায়ে মনে হল গোলাকার কিছু বসে আছে। দূরবীনের ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে ঠিক করলাম আরশির সামনে দাঁড়িয়ে দূরবীনে নিজেকে দেখব।

আরশির সামনে গিয়ে দূর থেকে দূরবীনে দেখলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এর বড় করার ক্ষমতা কি এতই বেশি যে এত কাছ থেকে কিছুই দেখা যায় না? আয়না থেকে আরেকটু পিছিয়ে এলাম। কিন্তু একই। বাঁ দিকের চাকাটা ঘোরাতে থাকলাম। বেশ খানিক্ষণ ঘোরানোর পর আগের মতো কতকগুলো কালো কালো দাগ পেলাম। দাগগুলো প্রচণ্ড কাঁপছে। এবার ডানদিকের চাকার পালা। খানিকক্ষণ ঘোরাতে ছবিটা পরিষ্কার হল। একটা গোলাকার বস্তু। আমি হাত নাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় পড়া গোলাকার বস্তুর প্রতিবিম্বটাতেও সামান্য কম্পন শুরু হল। কি হচ্ছে কিছু বুঝতে না পেরে চোখ থেকে দূরবীন সরিয়ে অন্য কাজে লেগে পড়লাম।

পরের দিন সকাল থেকে মেঘলা করেছিল। আর সঙ্গে তেমন ঠাণ্ডা হাওয়া। তবু অফিসে তো যেতে হবেই। শুক্রবার বলে বাঁচোয়া। সাড়ে তিনটে-চারটের মধ্যে পার্কিংলট ফাঁকা হয়ে যায়। আমারও তাড়াতাড়ি বেরোতে কোন অসুবিধে হল না। ইন্টারনেটে আইনস্টাইনের লেখা

'স্পেস টাইম' বলে একটা প্রবন্ধ দেখছিলাম। তারই একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। অবসর সময়ে পড়া যাবে। অবশ্য যে কাজই করি না কেন, মাথার মধ্যে দূরবীনের ঘটনাই ঘুরছিল।

বাড়িতে গিয়ে চা আর চিপ্‌স খেয়ে 'স্পেস টাইম' লেখাটা পড়তে শুরু করলাম। উনিশ'শ বাইশে লেখা। যে কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে চারটে অক্ষের বা মাত্রার প্রয়োজন হয়—X, Y, Z এবং সময়। এর থেকে কি বলা যায় না যে, সময়ের অক্ষের বিভিন্ন বিন্দু থেকে যদি বাকি তিন অক্ষতে বিস্তৃত কোন বস্তুকে দেখা হয়, তাহলে তার আকার বা মাত্রা অন্যরকম লাগবে। কথাটা মাথায় আসতেই সারা শরীরে কেমন শিহরণ খেলে গেল। তাহলে আমি দূরবীনে যে উল্টো শঙ্কু আকৃতি দেখেছিলাম তা কি অ্যাপার্টমেন্টেরই অন্য কোন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা ছবি। আর আয়নায় যে গোলাকার বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম সেটা কি আমারই?

এসব ভাবছি, এমন সময় কাঁচের দরজার মধ্য দিয়ে আকাশে চোখ পড়ল। আকাশে নানা রঙের বাজিতে আঁকা বিচিত্র আলপনা। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন ১২ অক্টোবর। তাই ১২ অক্টোবরে এই শহরে নানান ধরনের উৎসব হয়। দূরবীন ধরার সঙ্গে সঙ্গে চোখে ধরা দিল বাজির বর্ণচ্ছটা।

আকাশ থেকে লক্ষ্য সরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংলটে তাক করলাম।

ওটা কি হেঁটে যাচ্ছে? একটা চৌকাকৃতির জীব। যেন একটা বাক্সের মাথায় একটা নল বসানো। আর নলের ওপর একটা ত্রিকোনাকৃতি অদ্ভুত দর্শন মুখ। বাক্সের থেকে একখানা হাত আর নিচের দিকে ছোট একটা পা বেরিয়ে এসেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে আমার ব্যালকনির দিকে এগিয়ে

আসছে।

দূরবীন সরিয়ে খালি চোখে কিছুই দেখা গেল না।

ফের চোখে দূরবীন ধরলাম। ওই জীবটা অদ্ভুতভাবে হাতটাকে ডানার মতো করে নেড়ে সামান্য উড়ে সামনের গাছটায় গিয়ে বসল। গাছটার একটা ডালের মাথায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা চৌকো বাক্স ঝুলছিল। তারমধ্যে গিয়ে ঢুকল। খালি চোখে দেখার চেষ্টা করলাম। গাছের অন্য একটা ডালে মৌমাছির একটা চাক আছে। সেটা ছাড়া অন্যকিছুই চোখে পড়লনা। তবে কি ওই প্রাণী এমন কোন মাত্রার যা আমাদের খালি চোখে পড়ে না শুধু ধরা পড়ে এই বিশেষ দূরবীনে?

পরের দিন শরীর খারাপের অজুহাতে অফিসেই গেলাম না। সারা সকাল দূরবীন নিয়ে কমপ্লেক্স আর সামনের পার্কে ঘুরলাম। আমাদের চারদিকেই এক অজানা-অচেনা জগৎ, বহু বিচিত্র প্রাণী। এরমধ্যেই এই বিচিত্র দূরবীনের সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি যে আমার হাতে যে জিনিসটা এসেছে সেটা বিশ্বময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে। এর ডানদিকের আর বাঁ দিকের চাকা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে সময় ও মাত্রা পরিবর্তিত হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট একটা মাত্রার দৃশ্য পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

আয়নাতে আমি যে গোলাকার বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম সেটা আমার ছাড়া আর কারো নয়। তাই হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল।

হয়তো সময়ের অক্ষের অন্য কোন বিন্দু থেকে আমরা যেভাবে চারদিকের বস্তুকে খালি চোখে দেখি, সেভাবেই দেখতে পাবো।

একটা চেয়ার টেনে আয়নার সামনে বসে ফের দূরবীনের দু'দিকের চাকা পর্যায়ক্রমে ঘোরাতে থাকলাম। ধৈর্যের পরীক্ষা। অস্পষ্ট দাগ দেখা

যায়, মিলিয়ে যায়। ঘন্টা খানেক পরিশ্রমের পর চেয়ারটার পরিষ্কার ছবি দূরবীনের কাঁচে ধরা পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুট্ করে একটা আওয়াজ হলো। দেখি দূরবীন থেকে আরেকটা নব বেরিয়ে এসেছে। নিজের দিকে লক্ষ্য করে ওটা ঘোরাতে শুরু করলাম। আধপাক ঘোরাতেই দেখি — সামনে আমি নেই। চেয়ারে বসে আছে বছর আশির এক বৃদ্ধা।

এ কে? আমি? না না। আমাকে এত খারাপ দেখতে হতে পারে না। গাল ঝুলে পড়েছে। চোখে ভারী চশমা। সাদা চুল। ডান পায়ে ওটা কি? পায়ের নিচের দিকটা কৃত্রিম মনে হচ্ছে যেন।

চোখ থেকে দূরবীন সরিয়ে নিলাম। এ দৃশ্য সহ্য করার শক্তি আমার নেই। এ কি আমারই ভবিষ্যতের ছবি?

তাহলে কি দূরবীনের এই অ্যাডজাস্টমেন্টে পঞ্চাশ বছরের পরের পৃথিবীকে দেখতে পাবো?

কয়েকদিনের মধ্যেই দূরবীনের নেশাটা বহুগুণ বেড়ে গেল।

বুঝলাম কেন এই দূরবীন এত অভিশপ্ত। কেন এই দূরবীন বৃদ্ধার ছেলেকে আর শ্বশুরকে পাগল করে তুলেছিল।

বুঝতে পারলাম আমার রাত-দিনের সময় কেড়ে নিচ্ছে ঐ দূরবীন। যে সময় আসতে চলেছে, যে অবস্থা আসন্ন তাকে আমি পরিবর্তন করতে পারব না। খালি অসহায়ভাবে দেখে যেতে হবে। এখানেই এ দূরবীনের অসহায়তা। আর এই অসহায়তাই এর দর্শককে পাগল করে তোলে। আমার মনে হয় আইনস্টাইন এটা হিটলারকে দিয়েছিলেন যাতে হিটলার বুঝতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি কি হতে চলেছে! আর এর থেকে বিরত হয়। কিন্তু এ দূরবীন কখনোই ভবিষ্যতের ঘটনার স্রোতকে পাল্টাতে পারে না। হিটলারের পক্ষে তাই এই দূরবীনে ঠিকভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এতে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন হিটলারেরই এক

সেনাধ্যক্ষ। আর তাই তিনি পালিয়ে এসেছিলেন আমেরিকায়। তা এতক্ষণে কি বুঝলে? এরপরেও বলতে চাও দূরবীন শুধু মাঠে ক্রিকেট দেখার জন্য?

আমরা হাই হাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম —তা এটাই কি সেই দূরবীন?

—না, এটা আমেরিকার একটা বড় শপিং কমপ্লেক্স থেকে কেনা। দাম পঞ্চাশ ডলার। এতে যে কোন জিনিস কুড়িগুণ বড় দেখায়।

—তা ওটার কি করলে? - বিশ্বজিৎ দা দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করল।

—কিছুই করতে হয়নি। ভারতে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে চেক ইন লাগেজ থেকে ওটা চুরি হয়।

ব্রেন-ইন্টারনেট

অনেক রাত হয়েছে। তবু ঘুম আসছে না পার্থবাবুর। সারাদিন অলসভাবে বসে শুয়ে কাটালে কি আর ঘুম আসে!

বারান্দায় এসে বসলেন পার্থবাবু। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া। আর দু-দিন বাদে পূর্ণিমা। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতায় মিঠে আলোর আলপনা। দীর্ঘ জীবনের পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

পার্থবাবু বদলি হয়ে এই শহরে এসেছেন তা প্রায় মাসদুয়েক হল। এর আগে ছিলেন নিশীথপুর গ্রামে। প্রাথমিক বিভাগের অঙ্কের শিক্ষক। টানা পঞ্চাশবছর ওখানে পড়িয়েছেন। হঠাৎ বদলির আদেশ এল। বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে নবনালন্দাপুর শহরে চলে এলেন। এখানে ওনার একদমই ভালো লাগে না। একে তো পরিচিত কেউ নেই, তার ওপর লোকগুলোও যেন কেমন। মনোহরবাবু ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আসার আগে মনোহর বলেছিল,—ওখানে একবার যাও, বুঝতে পারবে আমরা কোথায় পড়ে আছি। বড়-বড় শপিং-কমপ্লেক্স। বেশিরভাগ জায়গাতেই রোবট কর্মচারি। রাস্তায়-রাস্তায় রোবট ট্রাফিক পুলিশ। রাস্তায় শয়ে-শয়ে একই চেহারার মানুষ ক্লোন।

পার্থবাবু একটু কথা বলতে ভালোবাসেন। নিশীথপুরে সেরকম গল্প



করার লোকের অভাব ছিল না। স্কুলের পরে আলিমের দোকানে গিয়ে রোজ আধঘন্টা আড্ডা মেরে আসতেন। কতরকম আলোচনা হত।

আর এখানে! এই তো সেদিন বড় একটা শপিং কমপ্লেক্সে বাজার করতে গিয়েছিলেন পার্থবাবু। চারদিকে রোবট কর্মচারী। আঙুল তুলে দেখালেই জিনিসপত্র ট্রলিতে তুলে দিচ্ছে। তারপরে হাসিমুখে 'থ্যাঙ্কু ফর অ্যাকসেপ্টিং মাই হেল্প' বলে উঠছে। নিশীথপুরে এ-সব নেই। এরকম ছোটখাটো ব্যাপারে সাহায্য চাইলে দু-একটা টিপ্পনিও জোটে।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়াটা একটু কমেছে। তবে বাতাস বেশ ঠান্ডা। আকাশ দিয়ে দু-একটা গাড়ি এখনও যেতে দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া রাতের দিকে আকাশ দিয়ে গাড়ি যেতে দেওয়া হয় না। তাই একটু বাঁচোয়া। তা না হলে তারাভরা আকাশটাই হয়তো হারিয়ে যেত গাড়ির ভিড়ে।

দরজায় একটা খুট করে আওয়াজ পেলেন পার্থবাবু। ফ্ল্যাটের বাইরের দরজাটা খুলে যাচ্ছে। একটা লোক আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকছে। অন্ধকারে লোকটার মুখ দেখার উপায় নেই। তবে একটু মোটার দিকেই চেহারা। ঘরে ঢুকেআস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বারান্দার এককোণে বসে থাকায় ওখান থেকে পার্থবাবুকে লোকটা দেখতে পেল না। তা ছাড়া রাত একটায় কেউ জেগে বসে থাকবে, এটাও চোরের পক্ষে আশা করা সম্ভব নয়। চোর! কথাটা মনে হতেই সারা শরীরে শিহরণ হল পার্থবাবুর। গত দশবছরে নিশীথপুরেও কোনও চুরির ঘটনা ঘটেনি। নব নালন্দাপুর তো আরও বড় শহর।

চোরেরা এখন প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতি। চোরের দেখা পাওয়া অতি ভাগ্যের ব্যাপার। বেশ খুশিতে মন ভরে গেল পার্থবাবুর। সবাইকে ডেকে এনে চোরের গল্প শোনানো যাবে। ইলেক্ট্রনিক সব মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার

বেরোবে।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে বারান্দায় মেঝেতে শুয়ে পড়লেন পার্থবাবু। যাতে আরও ভালো দেখা যায়। মাথাটা সামান্য তুলে চোরের কান্ড দেখতে থাকলেন। চোরটা পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরছে। বোধহয় কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। ধুৎ! এ-কীরকম চোর?

লোকটা এবার পকেট হাতড়ে লেসার টর্চ জ্বালল। মাটির দিকে আলো ফেলতে ফেলতে আস্তে-আস্তে পড়ার ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। সর্বনাশ! ঘরের দরজাটা তো বন্ধ। কোড কার্ড দিয়ে লক করা। ও ঢুকবে কি করে!

পার্থবাবুর নিজের অবশ্য কোনও কোড ডায়াল করতে হয় না। ওনার শরীরের মধ্যে প্রোথিত কার্ডের সাহায্যে একঘর থেকে আরেকঘরে গেলে দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়। অন্য কাউকে দরজা খুলতে গেলে একটা নির্দিষ্ট কোড দরজার মনিটরে ডায়াল করতে হবে।

অবশ্য চুরির আর আছেই বা কী। টাকাপয়সা কারেন্সি তো আর এখন চলে না। সব কেনাবেচা কার্ডেই হয়। নেওয়ার মধ্যে বেশ কিছু দামি পোশাক, কিছু ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র, কিছু গানের ভার্চুয়াল সিডি। আগে থেকে জানলে আরও ভালো কিছু ঘরে রেখে দিতেন।

চোরটা ইতিমধ্যে দরজার মনিটরে কী সব নাম্বার ডায়াল করছে। দরজাটা খুলে গেল। লোকটা পড়ার ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল পা টিপে-টিপে।

পার্থবাবু এতই অবাক যে মাথায় কিছু আসছিল না। কী করে কোডটা জানল! উনি নিজে আর হরু ছাড়া আর কারও পক্ষেই কোডটা জানা সম্ভব নয়। হরু ওনার রোবট চাকর। একমাস হল ও কাজ করছে। কিন্তু

হরু তো কোনওভাবেই কাউকে কোড জানাবে না।

তা ছাড়া নবনালন্দাপুরে বহু ডাকাবুকো লোকের বাস। তাদের ছেড়ে পার্থবাবুর মতো একজন হেঁজিপেঁজির বাড়িতে চোর আসবেই বা কেন? হরুকে নিতে? নাহ, হরুর মতো রোবট চাকর এখন ঘরে-ঘরে। তা ছাড়া যে-চোর এতকিছু জানে তার নিশ্চয়ই এটুকু জানা আছে যে চুরি করলেই রোবট নিজের বর্তমান অবস্থান স্যাটেলাইট সিস্টেম মারফত পুলিশকে জানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই রোবট চুরি আর থানায় ডাকাতি একইব্যাপার।

পড়ার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে চোরের বেরোনোর অপেক্ষায় বসে রইলেন পার্থবাবু। সমাজের প্রায় সব ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছে ওনার। শুধু চোর আর ডাকাত বাদে। তাই এ-সুযোগ উনি ছাড়বেন না। বেরোলেই গিয়ে ধরবেন। কিন্তু চুরির জিনিস কেড়ে নেবেন না। বরং আরও দু একটা জিনিস হাতে তুলে দেবেন। যেমন কফি মেশিনটা। একটু বেশি চিনি পছন্দ পার্থবাবুর। তা আজকাল মেশিনে এক চামচের বেশি চিনি দিলেই ঘড়ঘড় আওয়াজ করে মেশিনটা থেমে যাবে। বলে উঠবে, চিনির পরিমান বেশি হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া উচিত নয়।

হরুর সঙ্গে এ-নিয়ে রোজ কফি মেশিনের ঝগড়া। পার্থবাবুর কথামতো হরু মেশিনে দু-চামচ চিনি ঢালে আর কফি মেশিন থেমে যায়। এ-এক রোজকার অশান্তি। ব্যাটাকে দূর করতে না পারলে আর শান্তি নেই।

আর এক যন্ত্রণা অ্যালার্ম ক্লকটা। যতবার থামানো হয়, পরের বার আওয়াজ তত বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙিয়ে তবে ছাড়ে। ওটাকে বিদায় করতেই হবে।

এ-সব ভাবনার মাঝেই পড়ার ঘর থেকে লোকটা বেরিয়ে এসেছে। হাতে একটা বই। হ্যাঁ, এটার কথা তো পার্থবাবু ভুলেই গিয়েছিলেন। এ-রকম কাগজে ছাপা বই এখন বাজার চষে ফেললেও পাওয়া যাবে না। একেবারে অ্যান্টিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি। চারদিকে ইলেক্ট্রনিক বইয়ের ছড়াছড়ি। এতক্ষণে চুরির কারণ বোঝা গেছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পার্থবাবু বারান্দার দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন। একেবারে লোকটার মুখোমুখি। লোকটা পার্থবাবুকে দেখে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কি হে, চুরি করে পালানো হচ্ছে? চোরের শাস্তি কি তা জানো তো?

লোকটা দাঁত বের করে মাথা চুলকাতে-চুলকাতে হেঁ হেঁ করে বলে ওঠে,—হ্যাঁ, জানা আছে। অঙ্ক কষা, আর কবিতা লেখা।

অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। যন্ত্র দিয়ে যোগ-বিয়োগ করে আজ সবাই গুণ-ভাগ, যোগ-বিয়োগ ভুলে গেছে। এই তো সেদিন রাস্তায় পানের পিক ফেলেছিল বলে পুলিশ একটা লোককে ধরে গিয়ে তেরো আর বারোর গুণ করতে দিয়েছিল। লোকটা ইঞ্জিনিয়ার। তবু ক্যালকুলেটর ছাড়া গুণ করতে তার পাঁচঘন্টা লেগেছিল।

চুরির শাস্তি তো আরও কড়া। কোনও মারধর নয়, ধমকধামক নয়। শুধু চোরের ছবি আর জীবনবৃত্তান্ত কাগজে-কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়. যাতে সে লজ্জা পায়। সেইসঙ্গে একমাস ধরে একটা ফাইভস্টার হোটেলের ঘরে বন্ধ করে রেখে অঙ্ক কষতে আর দুঃখের কবিতা লিখতে দেওয়া হয়। সে তো অসম্ভব ব্যাপার।

পার্থবাবু দেখলেন ধরা পড়ে গিয়ে এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে দাঁড়িয়েও চোরটা ঘামছে। হয়তো এ-সব কথা ভেবেই। একটু মায়া হলো পার্থবাবুর।

বললেন,—তা বাপু এ-লাইনে কবে থেকে?

—প্রায় তিরিশ বছর হল। বাবা মারা যাওয়ার সময় বললেন, নগেন, আর যা-ই করিস, চুরি বন্ধ করিস না। চুরি একটা শিল্প।

—ও, তুমি তাহলে খানদানি চোর! তা তোমার বাবা চুরি ছাড়া আর কিছু করতেন?

—হ্যাঁ, অঙ্ক কষতেন আর কবিতা লিখতেন। যাতে ধরা পড়লে অসুবিধে না হয়।

—বাহ, তা তোমার আর কিছু করা হয়?

—চুরিরই বা সুযোগ কোথায় আজকাল, যা সব শাস্তি আর যা সিকিউরিটি চারদিকে! ও লাইন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। ওই মাঝেমধ্যে একটু-আধটু অভ্যেস রাখি আর কি! লোকের বাড়িতে ঢুকতে না পারলে, নিজের বাড়িতে ঢুকেই চুরি করি। আসল রোজগার তো কথা বলার ব্যবসা থেকে। যারা গল্প করার লোক পায় না, তাদের জন্য চার্জেবেল আড্ডা—ঘন্টায় দু-হাজার।

—চমৎকার! তা আমার বাড়িতে ঢুকলে কি করে? সিকিউরিটি কোড, ঘরের কোড এ সব কে বলল তোমায়?

—এ তো খুব সোজা। আজকাল চুরিও হাইটেক হয়ে গেছে। ইন্টারনেট থেকে।

—ইন্টারনেটে আমার বাড়ির কোড? বল কী হে?

—ওই যে সেদিন আপনি ব্রেনচিপ ব্যবহার করলেন শপিংমলে, যাতে সরাসরি আপনি এ চিপের সাহায্যে মস্তিস্ককে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছিলাম বটে। দোকানে দেখিয়েছিল যে ছোট একটা ব্রেন ইমপ্লান্টের মাধ্যমে কী ভাবে সরাসরি ব্রেনকে ইন্টারনেটে যুক্ত করা

যায়। আমি যা যা ভাবছিলাম সঙ্গে-সঙ্গে সে সব সাইট ইন্টারনেটে খুলে যাচ্ছিল। শুধু চিন্তা করেই কম্পিউটার চালনা করছিলাম। কম্পিউটারে হাত না দিয়ে মাত্র কয়েকমিনিটের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটা জিনিসও কিনেছিলাম বটে।

—তাহলেই বুঝুন! ভুল করবেন আপনি আর দোষ হবে চোরের। যে মুহূর্তে আপনি আপনার ব্রেন ইন্টারনেটে কানেক্ট করলেন আমি আপনার মগজ থেকে বাড়ির কোড, ঘরের কোড সব পেয়ে গেলাম। এ-সব চিপ ব্যবহার করা কতটা বিপজ্জনক সে সব আপনি পড়েননি!

—সর্বনাশ, তুমি তো সাংঘাতিক চোর হে! তা আর কী জেনেছ বল তো?

—এটুকু জেনেছি যে আপনি আমাকে ধরলেও পুলিশে দেবেন না।

—কেন? তুমি কি আমার প্রাণের বন্ধু নাকি?

লোকটা হেসে বলে ওঠে,—আপনি এজন্যই দেবেন না, কারণ, এ বইটা চল্লিশ বছর আগে আপনি নিজেও চুরি করেছিলেন। লাইব্রেরি থেকে।

পার্থবাবু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কথাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি!

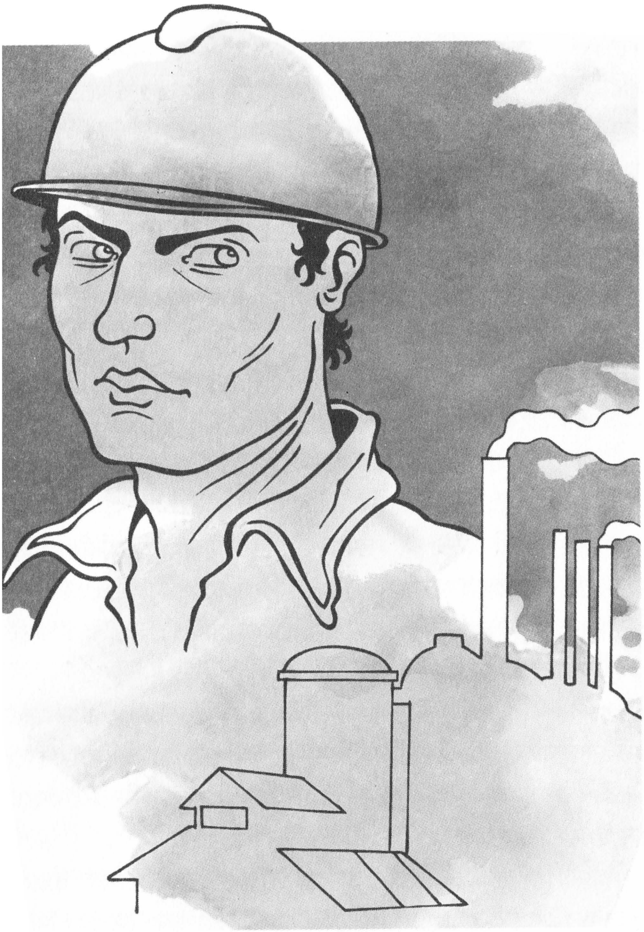
শুধু একটি সংখ্যার অপেক্ষায়

৮৬৬৪০

কি হে অনিমেষ! তোমার চিন্তা তো শেষ। একমাস নির্বিঘ্নে কেটে গেছে আর কি! তোমার তো ফুর্তির দিন আজ। পার্টি দিচ্ছ কবে? মিঃ সীতারামণ বলে উঠলেন। তামিল ভদ্রলোক। চাকরির শুরু থেকেই ব্লাস্টফার্নেসে কাজ করেছেন। জীবনের চল্লিশ বছর ব্লাস্টফার্নেসের রুক্ষতায় কাটিয়ে আজ চেহারায়, কথাবার্তায় পরিষ্কার রুক্ষতার ছাপ। এই স্টিল প্ল্যান্টের জেনারেল ম্যানেজার।

মুচকি হেসে অনিমেষ বলে উঠল,—সে কি? পার্টি-তো আপনার কাছেই পাওনা। এভাবে নির্বিঘ্নে ব্লাস্টফার্নেস চালু হয়ে গেল। প্ল্যান্টে কর্মাশিয়াল প্রোডাকসনও তো চালু হবার মুখে।

—ডোন্ট ওরি, মাই বয়। সে কালকেই হবে। এত বড় পার্টি হবে যা গোপালপুরে আজ অব্দি হয়নি। প্রধান অতিথি মন্ত্রী নয়, আমলা নয়, তুমি। একবছর ধরে তুমি যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছ তাতে প্ল্যান্ট



চালুর পুরো কৃতিত্ব তোমার প্রাপ্য। আমরা তো সব ওভারহেড।

—ওটা আপনার বিনয়, আপনি পুরো ব্যাপারটা এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা না করলে কি কাজটা এত তাড়াতাড়ি এগোত? ভারতে কোনও কাজ ঠিক সময়ে হয়? তার ওপরে ব্লাস্টফার্নেস। এই প্রথম বোধহয় পুরোপুরি ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে এ ধরনের কাজ হল। তাই না?

—আমার জ্ঞান যদ্দুর, তাতে তো তাই বলে। ভাবতেই অবাক লাগে, আগে হাজার হাজার লোক ছোটাছুটি করেও যে কাজ করতে পারত না, আজ তোমার একটা বোতাম টেপায় সে কাজ হচ্ছে। সত্যিই প্রযুক্তি কোথায় এগিয়েছে।

মুচকি হেসে অনিমেষ কম্পিউটারের পর্দায় সংখ্যাটা দেখে, ৮৬৬৪৫। মানে এর মাঝে আরো পাঁচবার স্কিপ গেছে।

—আচ্ছা অনিলিখা—স্কিপ জিনিসটা কি? ব্লাস্টফার্নেস কি? একটু বুঝিয়ে বল তো। বিশ্বজিৎদা অনিলিখার কথার স্রোতে বাধা দেয়।

রোজকারের মতো আমাদের শনিবারের আসরে অনিলিখা গল্প শোনাচ্ছে। চারধারে আমরা জমায়েত। বিশ্বজিৎদা, মিলন, ভোম্বল, ও অন্যান্যরা। আজকের দিনে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররা কর্তব্যের প্রতি কতটা ওয়াকিবহাল তা নিয়েই গল্পটা উঠেছে।

অনিলিখার বন্ধু অনিমেষ সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কি একটা মাল্টিন্যাশনালে কাজ করে। অনিলিখা গোপালপুরে ঘুরতে গিয়ে জানতে পারে, ওর বন্ধু অনিমেষ ওখানেই একটা স্টিল প্ল্যান্টে কমিশনিং করছে। সে প্রসঙ্গেই এই গল্প।

অনিলিখা বলে ওঠে, ব্লাস্টফার্নেস হচ্ছে যে কোনো স্টিল প্ল্যান্টের হৃৎপিন্ড। এখানেই লোহার আকরিকের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, লাইমস্টোন, কোয়ার্জাইট ও কোক মিলে পিগ আয়রন বা

লোহা তৈরি হয়। ব্লাস্টফার্নেসে এদেরকে একটা নিদিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে গলানো হয়। এর জন্যে স্টোভ থেকে আসা উত্তপ্ত গ্যাসের প্রবাহ বা ব্লাস্টকে ব্যবহার করা হয় বলে, একে বলে ব্লাস্টফার্নেস। স্টকহাউসে বড় বড় পাত্রে এইসব আকরিক থাকে। এই আকরিকগুলো নিদিষ্ট অনুপাতে কনভেয়ারের মাধ্যমে স্কিপে এসে পড়ে। কনভেয়ার একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত সব ধরনের আকরিকই এসে পড়ে স্কিপে। স্কিপ হচ্ছে একটা বড় নৌকা আকৃতির পাত্র যা ওই আকরিককে নিয়ে গিয়ে ফার্নেসে ঢালে। একদিকের স্কিপ যখন ওপরে উঠে গিয়ে ফার্নেসে ঢালে, তখন অন্যদিকের স্কিপ নিচে চলে আসে আর স্টকহাউসের আকরিক তার মধ্যে এসে পড়ে। স্কিপ দুটো এভাবে পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করতে থাকে।

অনিলিখা বুঝিয়ে চলে, স্কিপই হল ব্লাস্টফার্নেসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্কিপ যদি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় তো ব্যস! আকরিক আর ফার্নেসের মধ্যে গিয়ে পড়বে না। ফার্নেসে কোন কিছু না পড়লে উষ্ণতা প্রচন্ড হারে বাড়তে থাকবে। এর ফলে খুব মারাত্মক হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার পর ব্লাস্টফার্নেসের দেওয়াল বা রিফ্র্যাক্টরিস ভাঙতে শুরু করবে। কোটি কোটি টাকার জিনিস দশ-বারো ঘন্টার মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু ধ্বংস হয়ে যাবে তাই না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাইলখানেক এলাকা শ্মশান হয়ে যাবে বিষাক্ত গ্যাস কার্বনমনোক্সাইডে।

—সে কি তাহলে স্কিপের কোন গন্ডগোল হলে যে কোন সময়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে—আমি বললাম।

হ্যাঁ। সেজন্যেই নানান ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। কম্পিউটার পরিচালিত ব্যবস্থার কোন গন্ডগোলে যাতে স্কিপ বন্ধ না হয়ে পড়ে, তাই লোকাল কন্ট্রোল স্টেশন থেকেও স্কিপ চালানোর ব্যবস্থা থাকে। স্কিপের

জন্য অতিরিক্ত মোটর থাকে যাতে একটা জ্বলে গেলেও অন্যটা কাজ করে। এতেও যদি স্কিপ না চলে, তাহলে পাইপের মাধ্যমে ফার্নেসের মধ্যে জল ঢালার ব্যবস্থা থাকে।

—হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম। অনিলিখা আবার গল্পে ফিরে আসে—অনিমেষ আর আমি তখন কন্ট্রোলরুমে বসে আছি। ব্লাস্টফার্নেসের ঠিক পাশেই এ.সি. কন্ট্রোলরুম। এখান থেকেই অপারেটররা পুরো ফার্নেস কন্ট্রোল করে। এখানে কন্ট্রোল ডেস্ক, প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার ছাড়াও আছে বিশাল কম্পিউটারাইজড পর্দা। পর্দায় আলো জ্বলে নিভে প্ল্যান্টে কোথায় কি চলছে তা নির্দেশ করছে। কন্ট্রোল ডেস্কে অটোমেটিক মোড নির্বাচন করে একবার সুইচ টেপা হলেই কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার করে নেয়, কি আকরিক কতটা ঢালবে। সেই অনুযায়ী পুরো প্রসেসটা চলতেই থাকে।

অনিমেষ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, চল অনিলিখা। এবার ওঠা যাক।

—আচ্ছা, অনিমেষ, তুমি বারবার ওই সংখ্যাটা কি দেখছ?

—স্কিপ কতোবার গেল, তারই রেকর্ড। আমার একটা কাউন্টার আছে যা যতোবার স্কিপ যাচ্ছে, ততোবার এক করে বেড়ে যায়।

—তা ওটা অত দেখার কি আছে? এখনও কি কোন অসুবিধে আছে নাকি! মাসখানেক তো চলল। আর চিন্তা কি?

—এই সংখ্যাটা যখন ৮৬৭৬০ হবে তখন একটা দারুণ মজা হবে। ফিসফিস করে অনিমেষ বলে ওঠে—নাও। উঠে পড়। ওই মজাটা না দেখাই ভাল।

—কি মজা? ৮৬৭৬০-এর অর্থই বা কি? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

গাড়িতে যেতে যেতে বলব।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার হু চাং, সীতারামণও বেরিয়ে এলেন। হু চাং, এখানে যে চাইনিজ কনসালটিং টিম আছে তাদের প্রধান। উৎপন্ন লোহার মান দেখে উনি ভারি খুশি। খুবই উঁচু মানের লোহা। ফার্নেসের থেকে বেরনো রক্তাভ লোহা ক্রেনে করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কালকে বেরোনো ঐরকম লোহার এক টুকরো আমাকে, আরেক টুকরো অনিমেষকে দিয়ে সীতারামণ অনিমেষকে বলে উঠলেন,—এ লোহার টুকরো নিয়ে যাও। স্মৃতি হয়ে থাকবে। তোমার সৃষ্টি। আজ থেকে বহুবছর বাদেও যখন আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না, তখনও তোমার এই সৃষ্টি থেকে যাবে। ওই চুল্লির ধোঁয়ায় তোমার নাম লেখা থাকবে।

লোহার টুকরো হাতে নিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল অনিমেষ। ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটু আসছি।

খানিকবাদে কন্ট্রোলরুম থেকে ফিরে এসে বলল, চলো যাওয়া যাক।

হু চাং ফের পিছন থেকে বলে উঠলেন— কালকেই তো তুমি চলে যাবে, তাই না? তোমার মুক্তি।

ঘাড় ঘুরিয়ে মুচকি হেসে অনিমেষ উষ্ণভাবে করমর্দন করল। বছরখানেক কত কথা কাটাকাটি হয়েছে কাজ প্রসঙ্গে। আজ সেসব ভোলার দিন। অনিমেষ লোহার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে। পিছনে আমি।

খানিক দুরে আমাদের অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। আপাততঃ আমরা হোটেলে যাব। তারপরে ব্যাগ গুছিয়ে আধঘন্টার মধ্যে স্টেশনের দিকে এগোব। কাউকে না বললেও আমি ভালই জানি, আজই সাড়ে নটার ট্রেনে অনিমেষেরও টিকিট কাটা আছে। আমার আরও-দু-একদিন থাকার ইচ্ছে ছিল। অনিমেষই রাজি হয়নি। বাড়ি ফেরার জন্য ও পাগল।

গাড়িতে বসে অনিমেষ নিজেই বলল, ওই সংখ্যার রহস্যটা জানতে চাও, তাই না? তার আগে একটা ছোট গল্প করে নিই। এ জায়গাটায় আগে একটা গ্রাম ছিল জান?

—হ্যাঁ, তা আর জানি না! আমি তখন ছোট। কাগজে কত লেখালেখি! গ্রামের লোকেরা ছিল স্টিল প্ল্যান্টের বিপক্ষে। যেরকম হয় আর কি। বহুলোককে ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে হবে। বেশ বড়রকমের বিক্ষোভ হয়েছিল সেসময়। পরে অবশ্য মিটে গেছিল।

—হ্যাঁ, কাগজেপত্রে মিটে গেছিল। কিন্তু মনের আগুন কি অত সহজে নেভে? একরকম গ্রামের লোকেদের উচ্ছেদই করা হয়েছিল বলা যায়। সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পনেরো বছর হয়ে গেল, কেউ একটাও পয়সা পায়নি। দূরে নীল আকাশের বুকে চুল্লির চুলখোলা কালো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ ফের বলে উঠল—ধোঁয়া তো নয়। বহু লোকের দীর্ঘশ্বাস। কত লোকের কান্নার ওপর ওই ব্লাস্টফার্নেস দাঁড়িয়ে আছে তা আমরা কেউই জানি না।

—তাদের কি হয়েছে শেষ অব্দি?

—আমি কেবল সেরকম একটা পরিবারের কথাই জানি। এই ছোট্ট গ্রামে তাদের একটা মাথা গোঁজার বাড়ি ছিল। আর একটা দোকান ছিল। বেশ চলে যাচ্ছিল। সুখী পরিবার। যখন এখানে প্ল্যান্ট হবে ঠিক হল, তখন মোটে দশদিনের নোটিসে তাদের উঠে যেতে বাধ্য করা হয়। ভদ্রলোকের এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে তখন পাকাপাকি। হঠাৎ এসব ঝামেলার জন্য বিয়ে ভেঙে গেল। ভদ্রলোক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর সেরে ওঠেননি। বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আজও সেই পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য নিয়মিত শপথ নেয়। শপথ নেয় এই স্টিল প্ল্যান্টের সর্বনাশের। হ্যাঁ, অনিলিখা, আমি সেই অভাগা

ভদ্রলোকের ছেলের কথা বলছি।

চলন্ত গাড়ির জানালার দিকে মুখ ফেরায় অনিমেষ। বোধহয় চোখের জলকে লুকোবার জন্যে।

—সেই ছেলেটি কি তুমিই? আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।—অনিমেষ জবাব না দিয়ে শুরু করল,—একটা স্কিপ নিচ থেকে ফার্নেসের উপরে উঠতে উঠতে ঠিক তিরিশ সেকেন্ড সময় নেয়। একমাসে তাহলে স্কিপটা কতবার ওপরে যায়। খুব সোজা অঙ্ক ৩০*২৪*৬০*২ অর্থাৎ ৮৬৪০০ বার। একমাসের ট্রায়াল রান। আরো তিন ঘন্টা সময় হাতে রেখেছিলাম। সেই সময়ে স্কিপটা আরো ৩৬০ বার যাবে। আমি অঙ্কটা সেরকমই কষেছিলাম। যেই স্কিপ ৮৬৭৬০ বার ওপরে যাবে, আমি ওই কাউন্টারের সাহায্যে একটা ফ্ল্যাগ অন করব যা স্কিপকে চিরকালের মতো থামিয়ে দেবে।

বলতে বলতে অনিমেষের চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেছে। চুল্লির গনগনে আগুনের ধোঁয়া যেন ওর মুখে। ও বলে যায়,— হ্যাঁ, সেটাই হবে স্কিপের শেষ যাওয়া। পি. এল. সি. থেকে স্কিপ চালানোর জন্য যে সঙ্কেত যায়, তা আর যাবে না। অনিবার্যভাবে কোন আকরিক না পেয়ে ফার্নেসের উষ্ণতা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে। লোকে লোকাল কন্ট্রোল স্টেশন থেকে স্কিপ চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্কিপ নড়বেও না চড়বেও না। কারণ ওর সঙ্গে মোটর কন্ট্রোল সেন্টারের তারটা ইতিমধ্যেই ছেঁড়া থাকবে, বাকি রইল ফার্নেসে হোসপাইপ দিয়ে জল ঢালা। সে পথও বন্ধ। তার জন্য যে মোটর আছে তাও দেখা যাবে জ্বলে গেছে।

—সর্বনাশ একি তুমি করেছ অনিমেষ! আমি চমকে বলি উঠি—তুমি জেনে শুনে এভাবে ফার্নেসকে ধ্বংস করছ। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই তো রিফ্র্যাকটরিস ভাঙতে শুরু করবে তারপর, তারপর বিস্ফোরণ

গাড়িতে বসে অনিমেষ নিজেই বলল, ওই সংখ্যার রহস্যটা জানতে চাও, তাই না? তার আগে একটা ছোট গল্প করে নিই। এ জায়গাটায় আগে একটা গ্রাম ছিল জান?

—হ্যাঁ, তা আর জানি না! আমি তখন ছোট। কাগজে কত লেখালেখি! গ্রামের লোকেরা ছিল স্টিল প্ল্যান্টের বিপক্ষে। যেরকম হয় আর কি। বহুলোককে ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে হবে। বেশ বড়রকমের বিক্ষোভ হয়েছিল সেসময়। পরে অবশ্য মিটে গেছিল।

—হ্যাঁ, কাগজেপত্রে মিটে গেছিল। কিন্তু মনের আগুন কি অত সহজে নেভে? একরকম গ্রামের লোকেদের উচ্ছেদই করা হয়েছিল বলা যায়। সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পনেরো বছর হয়ে গেল, কেউ একটাও পয়সা পায়নি। দূরে নীল আকাশের বুকে চুল্লির চুলখোলা কালো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ ফের বলে উঠল—ধোঁয়া তো নয়। বহু লোকের দীর্ঘশ্বাস। কত লোকের কান্নার ওপর ওই ব্লাস্টফার্নেস দাঁড়িয়ে আছে তা আমরা কেউই জানি না।

—তাদের কি হয়েছে শেষ অব্দি?

—আমি কেবল সেরকম একটা পরিবারের কথাই জানি। এই ছোট্ট গ্রামে তাদের একটা মাথা গোঁজার বাড়ি ছিল। আর একটা দোকান ছিল। বেশ চলে যাচ্ছিল। সুখী পরিবার। যখন এখানে প্ল্যান্ট হবে ঠিক হল, তখন মোটে দশদিনের নোটিসে তাদের উঠে যেতে বাধ্য করা হয়। ভদ্রলোকের এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে তখন পাকাপাকি। হঠাৎ এসব ঝামেলার জন্য বিয়ে ভেঙে গেল। ভদ্রলোক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর সেরে ওঠেননি। বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আজও সেই পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য নিয়মিত শপথ নেয়। শপথ নেয় এই স্টিল প্ল্যান্টের সর্বনাশের। হ্যাঁ, অনিলিখা, আমি সেই অভাগা

ভদ্রলোকের ছেলের কথা বলছি।

চলন্ত গাড়ির জানালার দিকে মুখ ফেরায় অনিমেষ। বোধহয় চোখের জলকে লুকোবার জন্যে।

—সেই ছেলেটি কি তুমিই? আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।—অনিমেষ জবাব না দিয়ে শুরু করল,—একটা স্কিপ নিচ থেকে ফার্নেসের উপরে উঠতে উঠতে ঠিক তিরিশ সেকেন্ড সময় নেয়। একমাসে তাহলে স্কিপটা কতবার ওপরে যায়। খুব সোজা অঙ্ক ৩০*২৪*৬০*২ অর্থাৎ ৮৬৪০০ বার। একমাসের ট্রায়াল রান। আরো তিন ঘন্টা সময় হাতে রেখেছিলাম। সেই সময়ে স্কিপটা আরো ৩৬০ বার যাবে। আমি অঙ্কটা সেরকমই কষেছিলাম। যেই স্কিপ ৮৬৭৬০ বার ওপরে যাবে, আমি ওই কাউন্টারের সাহায্যে একটা ফ্ল্যাগ অন করব যা স্কিপকে চিরকালের মতো থামিয়ে দেবে।

বলতে বলতে অনিমেষের চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেছে। চুল্লির গনগনে আগুনের ধোঁয়া যেন ওর মুখে। ও বলে যায়,— হ্যাঁ, সেটাই হবে স্কিপের শেষ যাওয়া। পি. এল. সি. থেকে স্কিপ চালানোর জন্য যে সঙ্কেত যায়, তা আর যাবে না। অনিবার্যভাবে কোন আকরিক না পেয়ে ফার্নেসের উষ্ণতা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকবে। লোকে লোকাল কন্ট্রোল স্টেশন থেকে স্কিপ চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্কিপ নড়বেও না চড়বেও না। কারণ ওর সঙ্গে মোটর কন্ট্রোল সেন্টারের তারটা ইতিমধ্যেই ছেঁড়া থাকবে, বাকি রইল ফার্নেসে হোসপাইপ দিয়ে জল ঢালা। সে পথও বন্ধ। তার জন্য যে মোটর আছে তাও দেখা যাবে জ্বলে গেছে।

—সর্বনাশ একি তুমি করেছ অনিমেষ! আমি চমকে বলি উঠি— তুমি জেনে শুনে এভাবে ফার্নেসকে ধ্বংস করছ। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই তো রিফ্র্যাকটরিস ভাঙতে শুরু করবে তারপর, তারপর বিস্ফোরণ

হয়ে সব, সবকিছু শ্মশান হয়ে যাবে। তুমি, তুমি—

রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে অনিমেষ বলল,—পারলাম কই অনিলিখা? হাতে যতক্ষণ ওই লোহার টুকরোটা পাইনি, ততক্ষণ সব ঠিক ছিল। কিন্তু ওই লোহাটাই যে আমার সব কিছু ওলটপালট করে দিল। আমার সব ক্যালকুলেশন একমুহুর্তে ভুল হয়ে গেল। এই একটুকরো লোহার জন্যেই যে মাসের পর মাস ঘুমোই নি। রাতের পর রাত জেগে কমিশনিং করেছি। তাও মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম খুব। মনে করার চেষ্টা করেছিলাম সাদা কাপড়ে ঢাকা সেই কঙ্কালসার চেহারাটাকে, নিমতলা শ্মশানের সেদিনের সেই সন্ধ্যাকে। কিন্তু নাহ, পারলাম না। ওই - হ্যাঁ, ওই চুল্লির ধোঁয়াই জিতে গেল বাজি। আমি ফিরে গিয়ে আরো দুটো শূন্য সংখ্যাটার পাশে বসিয়ে দিলাম। অনি, ওরা আমাদের মোটে দশদিন সময় দিয়েছিল আর আমি? আমি ওকে প্রায় দশ বছরের জীবন দিলাম শুধু ওই লোহার টুকরোটার জন্যে।

একটাই দিন

শীতের ছুটির দিনে বাড়িতে বসে থাকতে কারো কি ভালো লাগে? এমন মিষ্টি রোদ, স্নিগ্ধ বাতাস, এমনই আলতো শীতের ছোঁয়া, নলেন গুড়ের গন্ধ, মনটা যেন সবসময় বাইরে পড়ে থাকে। তা সেই মনের ডাকে সাড়া দিয়েই বেরিয়েছিলাম শনিবারে। বনগাঁয় আমার ছোটপিসি থাকেন। অনেকদিন পিসির সঙ্গে দেখা হয়নি। দূরত্বের জন্যই যাওয়া হয়নি অনেকদিন।

ভোর-ভোর বেরিয়ে দশটার মধ্যেই বনগাঁ পৌঁছে গেলাম। পিসি তো আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। বহুদিন বাদে দেখা, শেষ এক বিয়েবাড়িতে দেখা হয়েছিল। তা বছরখানেক তো হবেই। তাও আবার না বলে কয়ে হঠাৎ আসা। আজকাল ব্যস্ত থাকি বলে ফোনেও তেমন কথা হয় না। আসলে ফোন করার কথা খেয়ালই থাকে না। আর তা ছাড়া পিসি কানেও কম শোনেন। ফোনে কী শুনতে, কী শুনবেন! পিসির বয়স হয়েছে। এক ছেলে। তা সে বাইরে চাকরি করে। কথা বলার লোক বলতে পিসির তেমন কেউ নেই। আশেপাশের বাড়ির লোক, কাজের লোক, এরাই হল পিসির কথা বলার সঙ্গী। আমাকে দেখে সেই যে ছোটবেলার বাড়ির গল্প শুরু করলেন, তা সহজে শেষ হওয়ার নয়।

নিয়ম যখন ভাঙে

ভেবেছিলাম ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে বেরিয়ে আসব। কিন্তু তা হল কই! পিসি তো নাছোড়বান্দা। সেদিন ফিরতে দেবেন না কিছুতেই। ভুরিভোজ করে আমিও ক্লান্ত। শেষে অনেক বুঝিয়ে বেরতে যখন পারলাম, তখন বিকেল পাঁচটা। রাস্তার আলো জ্বলে ওঠেনি বটে, কিন্তু বেশ অন্ধকার করে এসেছে। পাখিরা সব ঘরে ফিরছে। তাদের কলতানে কানপাতা দায়। সামান্য যেটুকু আলো ছিল, মিনিটকুড়ির মধ্যে সেটুকুও উধাও হয়ে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। দু'ধারের ধানখেত আর গাছ-গাছালির উপর কে যেন হঠাৎ ম্যাজিশিয়ানের মতো তারাজ্বলা রাতের কালো চাদর টেনে দিল।

গাড়ি চালাতে বেশ লাগছিল। জানলা তুলে এসি চালিয়ে দিলাম। কলকাতায় এই নির্জনতাটা আজকাল আর পাওয়া যায় না। অবশ্য, পুরো রাস্তাটা যে নির্জন গাড়িহীন, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। মাঝেমধ্যেই হাট-বাজার, দোকান-পাট এসব পড়ছে। হর্নের আওয়াজ, গাড়ি, বাস, লরি, সাইকেলভ্যান, সবই আছে। তবু তার সঙ্গে দু'ধারে গাছের ছায়া-ছায়া অবয়ব, তারাভরা আকাশ এসবও আছে।

এরকম এক জায়গায়, একটা মোড়ে হঠাৎ অতীনের দেখা পেলাম। ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের সামনে একটা টুলে বসে চা খাচ্ছে। ঠিক ওই জায়গাটাতেই আমার সামনে একটা ভ্যান এসে পড়ায় গাড়ির স্পিডটা কমিয়েছিলাম। তাই চোখে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা রাস্তার এক পাশে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। অতীন আমার স্কুলের বন্ধু। একসঙ্গে বারোটা ক্লাস পড়েছি। অসম্ভব ভালো ছাত্র ছিল। শুধু লেখাপড়ায় নয়, মনের দিক থেকেও খুব ভালো, খুব সেনসিটিভ টাইপের, নরম প্রকৃতির।

কিন্তু, এ কী চেহারা হয়েছে ওর! সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রোগা,



হাড় বের করা চেহারা। চোখের নীচটা বসে গিয়েছে। চোয়াল ভেঙে গিয়েছে। কপালে গভীর ভাঁজ। একহাতে চায়ের কাপ ধরে আনমনে কী যেন ভাবছে। অন্য হাতটা দিয়ে টুলে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে দৃষ্টিহীন চোখে

তাকিয়ে আছে। ওর চোখের সামনে দিয়েই এলাম। দু'বার ডাকলাম, কোনো সাড়া নেই। তৃতীয়বারের ডাকে সাড়া মিলল। ও হকচকিয়ে বলে উঠল, "পুলক! তুই-তুই এখানে?" চমকে ওঠায় চা-টা চলকে ওর আঙুল ভিজিয়ে দিল।

"এই এদিকে এসেছিলাম। পিসির বাড়ি। কলকাতা ফিরছি। তা তুই?"

"আমার বাড়ি তো এখানেই। এই মিনিটপাঁচেক হাঁটা। তা ভালোই হল। আমারও আজ কলকাতায় যাওয়ার ছিল। তোর সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধে নেই তো?"

" না-না, কী বলছিস। আমি তো একাই আছি। চল, গাড়িতে উঠে বোস। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। এতটা পথ। আমারও সময় কাটছিল না।"

ও যেন আমারই অপেক্ষায় ছিল। বলতে না বলতেই উঠে দাঁড়াল। টুলটার পাশে একটা চটের ব্যাগ রাখা। ওটা নিয়ে ধীরেসুস্থে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ও গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। একটু অবাক হলাম।

"তোর সঙ্গে আর কোনো ব্যাগ নেই।"

"না," বলে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে অতীন গাড়িতে উঠে বসল। বাইরের খোলা হাওয়াতেও ওর গায়ে ঘামের সামান্য কটূ গন্ধ পেয়েছিলাম। বন্ধ গাড়িতে ও ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ঘামের বোটকা গন্ধ আর তাতে যেন মিশে আছে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।

গাড়িটা স্টার্ট করেই প্রশ্নটা করে ফেললাম, "তুই তো ডাক্তারি পড়েছিলি, তারপর?"

'তারপর'—এর পর প্রশ্নচিহ্ন জোরালো ছিল। কারণ, যে ছেলে জয়েন্টে প্রথম হয়ে মেডিকেলে ভর্তি হয় তার এমন কী হতে পারে যে

বারো বছর পর তার এরকম অবস্থা! খুব চালাক-চতুর ছেলে ও কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু তা বলে ডাক্তারি পাশ করার পরে, ওর আদৌ কোনো পসার হবে না বা চাকরি পাবে না, এমন তো হওয়ার কথা নয়। ও খুব ভালো ডাক্তার না হলেই বরং আমি অবাক হব। যার মধ্যে অত ডেডিকেশন, মানুষ বাঁচানোর অমন তাগিদ ছিল, সে যদি ভালো ডাক্তার না হয়, তো কে হবে?

ও দেখলাম গাড়ির বাঁদিকের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ কোনো উত্তর পেলাম না। তারপর আস্তে আস্তে বলে উঠল, "এখানকার একটা হাসপাতালে আছি। হাবড়া স্টেট জেনারেল হসপিটাল।"

"তা তোর এরকম অবস্থা ... বাড়িতে কোনো অসুবিধে হয়েছে। ছেলে, মেয়ে, বউ ..."

"কেউ নেই। বিয়েই করিনি।"

"তবে? এরকম চেহারা। জামাটা বোধ হয় দু'তিন ধরে পরে আছিস তাই না? কোনো সমস্যা হয়েছে?"

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতীন। প্রায় একশো মিটার গাড়ি এগনোর পরে নীরবতা কাটিয়ে ফের বলে উঠল, "বললে বিশ্বাস করবি না পুলক। ভাববি পাগলের প্রলাপ। না বলাই ভালো।"

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। না, চোখে তো সেরকম অস্বাভাবিকতা কিছু নেই? গাড়ির আধো অন্ধকারেও স্পষ্ট ওর সেই উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। সামনের রাস্তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ধীরে সুস্থে অতীন বলতে লাগল, "ধর, তুই যাই করিস না কেন, তুই যদি দেখিস, সেই এক, একই দিন বারবার ফিরে-ফিরে আসছে; কী রকম লাগবে? বল, কী রকম লাগবে? ঠিক যে জিনিস গত পরশু দেখেছিস,

গতকাল দেখেছিস, সেই একই দৃশ্য আবার আজকে। হ্যাঁ, আবার আজকে ফিরে আসছে। তুই যাই করিস না কেন ঘটনার আর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সেই একই ঘটনা।"

অতীনের গলার স্বরে কেমন যেন ভয়ের ছাপ।

"আমি এমন একটা দিনে আটকে গিয়েছি যে তার থেকে আর বেরতে পারছি না। নতুন দিন আর আসছে না," মুখটা হাত দিয়ে ঢেকে আস্তে আস্তে শেষের কথাগুলো বলে উঠল ও। গাড়িতে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল। বন্ধ করে বলে উঠলাম, "কী আবোল তাবোল বকছিস। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?"

"জানতাম, তুইও ঠিক একই কথা বলবি। সবার মতো। আমি যা বলছি ...বিশ্বাস কর...সব সত্যি," বলে নড়েচড়ে উঠে সামনের রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, "তুই নিজেই দেখবি। আজও একই জিনিস হতে চলেছে।" ও বলতে থাকে, "দু'কিলোমিটার পরে একটা বড় হাট পেরবি। ওটা পেরনোর ঠিক এক কিলোমিটার পরে দেখবি একজন মাঝবয়সি লোক বয়স পয়ঁত্রিশ-চল্লিশ, সাদা-লাল হাফহাতা জামা। নীল প্যান্ট। সঙ্গে একটা বছরআটেকের ছেলে। সবুজ শার্ট-কালো হাফপ্যান্ট। অন্ধকারে তুই হঠাৎ দেখতে পাবি না। আমিও যেমন দেখতে পাইনি। দেখবি ঠিক এই গাড়িটার সামনে চলে আসবে।"

"মানে? গাড়ির সামনে?"

"হ্যাঁ, গাড়ির একদম সামনে। হঠাৎ করে ঠিক গাড়ির সামনে চলে আসবে। গাড়ি থামাবি না।"

"কী বলছিস?"

"বিশ্বাস কর। দাঁড়ালেই আর রক্ষে নেই। ওরা গাড়িতে উঠে আসবে। ওরা কয়েকমাস আগে এই রাস্তায় ঠিক ওখানেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।"

হেসে উঠলাম, "তার মানে ভূত! মাই গড। তোর মতো ছেলেও আজকাল ভুতে বিশ্বাসী। না, ভগবানের থেকে ভুত দিনকে-দিন পপুলার হয়ে উঠছে দেখেছি।"

"কিন্তু ঠিক এটাই হবে। আমায় কথা দে, এরকম দেখলে দাঁড়াবি না। শুধু আমার কথা মনে রাখবি। দাঁড়ালেই ওরা গাড়িতে উঠে আসবে।"

"আচ্ছা বাবা, কথা দিলাম। ভুত ও ভূতের বাচ্চাকে চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাব। ঠিক তো?"

কথা বলতে-বলতে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছি। দু'কিলোমিটার বাদে একটা হাট মতো পড়ল। প্রচুর লোকের ভিড়। ফুলমূল, তরিতরকারির বাজার মূলত। রাস্তার দু'দিকে ভ্যান ভর্তি করে শাকসবজি রাখা। প্রায় পুরো রাস্তা জুড়েই হট বসেছে। গাড়ি যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই? টিকটিক করে খানিকক্ষণ চালানের পর আবার ফাঁকা রাস্তা শুরু হল। অ্যাক্সিলারেটারে পা দিলাম। স্পিডটা বাড়িয়ে এক কিলোমিটার মতো গিয়েছি। পাশ থেকে অতীন ফিসফিস করে বলে উঠল, "সামনেই, আর বড়জোর দু'শো মিটার। বাঁদিকে কলা গাছের সারি পড়বে। হঠাৎ দেখবি..."

"ভূত আর ভূতের বাচ্চা, তাই তো?"

বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। জোরালো হেডলাইট কুয়াশা ভেদ করে সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তা। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এক মাঝবয়সি লোক। তার হাত ধরে একটা বছরআটেকের বাচ্ছা। একেবারে ঠিক অতীনের বর্ণনা মতো। ওরা ছুটে রাস্তা পেরতে যাচ্ছে। ব্রেক কষে গাড়ির স্পিডটা কমিয়ে দিচ্ছিলাম। অতীন চেঁচিয়ে উঠল, "থামিস না! পুলক, থামিস না! ওরা মানুষ নয়। জোরে চালিয়ে যা।"

কী হল বুঝলাম না। মাথা কাজ করছিল না। অতীন যা বলল, তাই

করলাম। গাড়িটা ঝড়ের বেগে ওদের দিকে এগিয়ে এল মুখদুটো এক ঝলক দেখলাম। দু'জনেই গাড়ির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। ওদের চোখের মণি নীল। অন্ধকারে জ্বলছে। চোখের দৃষ্টিতে ভয়।

ধাক্কার আওয়াজ হল না। চিৎকার শুনলাম না। মনে হল হঠাৎ একটা জোরালো হাওয়া যেন গাড়ির উপর দিয়ে চলে গেল। গাড়িটা সামান্য কেঁপে উঠল।

মুখ ঢেকেছিল অতীন। আমি হতবাক। দু'মিনিট বাদে আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, "অতীন, এ কী করলাম! আমি কি ওদের মেরে ফেললাম! ফিরে যাব?"

"না-না। ঠিক করেছিস। চোখগুলো দেখলি না! ওরা কেউ বেঁচে নেই। আমাদের উপায় ছিল না। শোন, এই রকম জোরে চালাতে থাক। একটা বাইক দেখবি পিছন থেকে জোরে আসবে। তোর ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করে সামনে চলে আসবে। থামবি না। ধাক্কা মেরে চলে যাবি। থামলেই বিপদ।" ঠিক তাই হল। দু'-তিন মিনিট বাদে একটা বাইক ঝড়ের বেগে ডানদিক দিয়ে সামনে এল। দুটো লোকাল লোক লুঙ্গি পরা। গায়ে শার্ট। কারও মাথাতেই হেলমেট নেই। হাত দেখিয়ে আমাদেরকে দাঁড়াতে বলছে। হাবভাব খুবই উগ্র। মনে হল, গালাগাল দিচ্ছে। বুঝলাম, অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারেই দাঁড়াতেই বলছে। দাঁড়ালাম না। সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারলাম বাইকে। বাইকটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। সাইড মিররে দেখলাম, বাইকটা রাস্তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে, পাশের মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে দেখলাম অতীন খানিকটা শান্ত হয়েছে। ওর মুখের দিকে তাকালাম। গাড়িতে এসি চালানো সত্ত্বেও ঘামছে। ঠিক আমারই মতো।

ও বিড়বিড় করে বলে উঠল, "দেখলি তো, বলেছিলাম। ঠিক সেই, সেই একই দিন ফিরে ফিরে আসে, সে যেখান দিয়েই শুরু করি না কেন।"

এবার থামল অতীন।

গাড়িতে এসি-র আওয়াজটুকু ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। আমার স্টিয়ারিংয়ে রাখা হাত এখনও কাঁপছে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার কল্পনার বাইরে। এ কি চোখের ভুল! নাকি আমি সত্যিই দু'দুটো অ্যাক্সিডেন্ট... চরজনকে গুরুতর আহত করে...নাকি মেরে ফেলেই পালিয়ে এলাম।

চেঁচিয়ে উঠলাম, "অতীন! আর উই ম্যাড! দু'দুটো অ্যাক্সিডেন্ট! আর আমরা পালিয়ে যাচ্ছি অ্যাক্সিডেন্ট সিন ছেড়ে। ওদের সাহায্য না করেই! "

একটুও উত্তেজিত হল না অতীন। আস্তে-আস্তে বলে উঠল, "সেদিন যে কী হল! তাড়া ছিল। একটা ক্রিটিকাল অপারেশনের জন্য 'আর জি কর' হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাটের ভিড়টা কাটতেই স্পিডটা বাড়িয়েছি। সামনে ফাঁকা রাস্তা। হেডলাইটের আলোর বাইরে সেদিনও রাস্তায় বিশেষ, আলো ছিল না। চাঁদটাও বোধহয় মেঘের আড়ালে ছিল। হঠাৎ...বুঝলি, দেখলাম ওই ভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে ছুটে রাস্তা পার হতে যাচ্ছেন। একটু হকচকিয়ে গেলাম। সংবিৎ ফিরতেই ব্রেক কষলাম। পুরো গাড়ি কিন্তু থামল না। যখন থামল, তখন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। শরীর দুটো গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল দূরে। বুঝলি, ডাক্তার হয়ে কত রোগীকে বাঁচিয়েছি, আর সেই...সেই হাতেই একটা ছোট বাচ্চা ছেলে...যার জীবন সবে শুরু হয়েছে...যে তার বাবার হাত ধরে নিশ্চিন্তে রাস্তা পর হতে যাচ্ছে, তাকে..." ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অতীন।

মিনিটখানেক পর আবার বলতে শুরু করল, "কেন জানি ধাক্কা মারার পরই মনে হয়েছিল যে, ওরা বেঁচে থাকতে পারে না। তবুও দাঁড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু মন বলল পালাতে। স্পিড বাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম। খানিক

বাদে দেখি একটা বাইক নিয়ে কেউ তাড়া করেছে। নিশ্চয়ই দেখেছিল ঘটনাটা। একটা সময় বাইকটা সামনে চলে এল। তখনও থামিনি। মতিস্থির ছিল না। ভাবছিলাম, কত তাড়াতাড়ি পালানো যায়। ধাক্কা মেরে বাইকটাকে ফেলে দিলাম। ঠিক যেভাবে তুই ধাক্কা মারলি, সেভাবেই। কিন্তু পালাতে পারিনি, আজও ওই দিনটাতেই পড়ে আছি। বারবার সেই অ্যাক্সিডেন্ট। সেই একই লোক।”

কাঁপা হাতে স্টিয়ারিং ধরে আমি তখনও গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। অতীনের বলা অর্ধেক কথা আমার কানেই ঢুকছিল না। বোধ হয় একটু আস্তেই চালাচ্ছিলাম। পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে কয়েকবার হর্ন দিয়ে ওভারটেক করে চলে গেল। হেডলাইটের আলোটা কুয়াশার জাল ভেদ করে সামনে গিয়ে পড়েছে। তাতেই দেখলাম সামনে রাস্তাটা বেঁকে গিয়েছে। আর বাঁকের মুখে দূরে একটা গাছের তলায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

অতীন বলে উঠল, “এবার একটু আস্তে কর। এক মিনিট দাঁড়া। ওই গাছটার কাছে। ভয় নেই।”

বলার দরকার ছিল না। গাড়ি চালানোর শক্তি তখন আমার আর সত্যিই ছিল না। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে আর-এক অতীন। ঠিক এই একই পোশাক পরা। হাতে সেই চটের থলি।

ঘাড় না ঘুরিয়েই শুনতে পেলাম, পাশ থেকে ও বলছে, “আমার গাড়িটা শেষে এই গাছে এসে ধাক্কা মেরেছিল। স্পিড নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে। স্পট ডেড।”



জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায়। হিন্দু স্কুলের কৃতী ছাত্র। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইআইএম কলকাতা থেকে অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা। বর্তমানে উচ্চপদে কর্মরত। কর্মসূত্রে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ইউরোপ ... নানা দেশে দীর্ঘদিন থেকেছেন।

লেখালেখির শুরু ১৯৯৪ কিশোর ভারতী ও আনন্দমেলার পাতায়। লেখার বিষয় প্রধানত বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান, রহস্য হলেও কিশোরসাহিত্যের সব ধারায় অনায়াস বিচরণ। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ:গ্লোবাল ওয়ার্মিং, মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন, রহস্য যখন ডারউইন, সংকেত রহস্য, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, দেশবিদেশের সেরা কল্পবিজ্ঞান, সারা বিশ্বের সেরা রূপকথা, এই পৃথিবী একশো বছর পরে ইত্যাদি। নেশা—কল্পবিজ্ঞান ও রহস্যকাহিনী লেখালেখি, বিজ্ঞান চর্চা ও ব্যাডমিন্টন খেলা।

নিয়ম যখন ভাঙে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী বাংলা
কিশোর সাহিত্যে এক অত্যন্ত
জনপ্রিয় নাম। তাঁর প্রত্যেকটা
লেখাই অন্য স্বাদের। গল্পের
অভিনবত্ব, বর্ণনা, বিশ্লেষণ,
গভীর মানবিকতাবোধ
আমাদের এককথায় অভিভূত
করে। গত কুড়ি বছরে বিভিন্ন
নামকরা কিশোর পত্র-পত্রিকা,
শারদীয়া ও রেডিওতে
সম্প্রচারিত গল্প থেকে
লেখকের পছন্দের কিছু গল্প
নিয়ে এই সঙ্কলন। হাসি,
কল্পবিজ্ঞান, রহস্য,
সামাজিকতা আর তার সঙ্গে
অনিলিখা তো আছেই! ভূতও
বাদ নেই সেখানে।